শ্রীসরোজ কুমার রায় চৌধুরী

প্রকাশক—শ্রীঅমরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
১৩এ, মাইকেল দত্ত ষ্ট্রীট্, খিদিরপুর
কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ
১৩৪৫

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীগুরু লাইব্রেরী
২০৪ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্, কলিকাতা
কমলা বুক ডিপো
১৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা
ও
কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়

প্রিণ্টার: শ্রীসনৎকুমার সরকার
শ্রীপতি প্রে
১৪ নং ডি, এল, রা
কলিকাত

হরেক রকম

আজকে যে গল্প তোমাদের শোনাতে যাচ্ছি, সে গল্প বিশ্বাস করতে তোমাদের কষ্ট হবে। তোমাদের কেউ কেউ হয় তো অসম্ভব ব'লে হেসে উড়িয়েই দিতে চাইবে। তথাপি এ গল্প যে সত্যি সে বিষয়ে কোনো সন্দেহই নেই। যা আমরা কল্পনা করতে পারি না তাই অসম্ভব বলে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করা আমাদের স্বভাব। কিন্তু যতই দিন যাচ্ছে ততই আমাদের জ্ঞান বাড়ছে, কল্পনাও বৃহত্তর হচ্ছে আর সেই অনুপাতে অসম্ভবের তালিকা খাটো হচ্ছে। দুশো বছর আগে কেউ যদি বলতো, আমি একখানা গাড়ী দেখে এলাম, ঘণ্টায় ষাট মাইল জোরে দু'টো রেলের পাটির উপর দিয়ে ছুটছে। গাড়ীতে না আছে গরু, না আছে ঘোড়া,—আপনি চলছে! এ কথা শোনা মাত্র

সুস্থ লোকের দল তাকে পাগল ব'লে উড়িয়ে দিত। কিংবা ভাবতো পঞ্চাশ বছর আগে যদি কেউ টেলিভিসনের গল্প করত, লোকে তাকে কি বলত? টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, বায়োস্কোপ, গানের রেকর্ড, এমন কি ইলেকট্রিক আলো-পাখার গল্পও কিছুকাল আগে বুদ্ধিমান লোকেও বিশ্বাস ক'রতে চাইত না। তারপরে সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জ্ঞান অনেক বেড়ে গেছে। এখন ছোট শিশুর কাছেও ওগুলো আর অবিশ্বাস্য নয়। আমি জানি, আজ থেকে পঞ্চাশ কিংবা একশো বছর পরে তোমাদের মতো ছেলেরা অত্যন্ত সহজে আমার এই গল্প সত্য ব'লে মেনে নেবে এবং অবাক হয়ে ভাববে তোমরা এমন গল্পটিকে হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলে কি করে! তোমাদের অজ্ঞতা দেখে তাদের হাসি সেদিন থামতে চাইবে না। ভাববে, মাগো, সেকালের ছেলেরা কি বোকাই না ছিল! কিছু অসম্ভব নয়। প্রথম যখন রেলগাড়ী চলে তখন অনেক লোক তাকে দেবতা ভেবে ফুল, বেলপাতা নিয়ে পূজো করতে গিয়েছিল। সে কথা শুনে এখন তোমাদের হাসি পায় না?

কিন্তু তার আগে গল্পটাই বলি শোন।

অবশ্য ঘটনাটা আমার নিজের চোখে দেখা নয়। কিন্তু যিনি ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন তাঁর নিজের মুখের শোনা। তাঁর নাম কাউণ্ট নিকোলাই সোলোকফ্। জাতিতে রাশিয়ান। জারের আমলের অভিজাতবংশীয়দের তিনি একজন। রুশ-বিপ্লবের সময়ে প্রজারা যখন জারকে বন্দী ক'রে বলশেভিক রাজত্বের প্রতিষ্ঠা করলে, তখন আরও অনেকের সঙ্গে তিনি তাঁর

যা কিছু ধনরত্ন ছিল সব নিয়ে প্রাণভয়ে পালিয়ে এলেন ফ্রান্সে। সেই থেকে ফ্রান্সেই আছেন। আছেন অবশ্য নামমাত্র। কারণ দেশে দেশে ঘুরে বেড়ানোটাই তাঁর বাতিক। বেশীর ভাগ সময়ই তিনি জাহাজে জাহাজে ঘুরে বেড়ান একদেশ থেকে অন্য দেশে। এতে তাঁর ক্লান্তিও নেই, বিরক্তিও নেই। জাহাজটাকেই ঘরবাড়ী ক'রে নিয়েছেন।

এই রকম একটা জাহাজেই তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়। আমি যাচ্ছিলাম নাইরোবি, ব্যবসা-বাণিজ্যের চেষ্টায়। সময়টা গ্রীষ্মকালের গোড়ার দিক। সন্ধ্যার পরে ডেকের উপর চেয়ারে নিঃশব্দে বসে অসীম সমুদ্রের দিকে চেয়ে চেয়ে কত কি যে ভাবছিলাম তার ঠিকানা নেই। কি জানি কেন সমুদ্রের মাঝখানে এলে আমার মন একেবারে হালকা হয়ে যায়,—ছোট ছেলের মনের মত হালকা। সমস্ত মন একটি টুকটুকে লাল মোচার খোলার মতো জলের ঢেউএ ঢেউএ ভাসতে থাকে। চারিদিকে চেয়ে যখন পৃথিবীর চিহ্নমাত্র চোখে পড়ে না, তখন পৃথিবীতে ব'সে যা শিখেছি সব ভুল হয়ে যায়। ছোট শিশু মায়ের কোলে ব'সে যেমন নতুন পাঠ নেয়, সমুদ্র-জননীর কোলে ব'সে আমারও তেমনি নতুন পাঠ আরম্ভ হয়—খোলা মন নিয়ে। এত কথা তোমাদের কাছে বলবার উদ্দেশ্য এই যে, কাউন্ট যখন তাঁর অত্যাশ্চর্য্য গল্পটি শোনান, তখন শিশুর মত সরল বিশ্বাসে আমি এক নিশ্বাসে সমস্তটা শুনে যাই। একটা প্রশ্নও করি নি, কিংবা একবারও সন্দেহ জানাইনি। আজও আমি গল্পটাকে সত্য ব'লেই বিশ্বাস করি।

সে যাই হোক, সেদিন সন্ধ্যার পরে আমি একা ডেকের এক প্রান্তে একখানি ডেক-চেয়ারে ব'সে ব'সে অনেক কথাই এলো-মেলো ভাবছিলাম। হঠাৎ পিঠে কার স্পর্শ অনুভব ক'রে চমকে চেয়ে দেখি কাউণ্ট।

তাঁর বয়স হয়েছে। এ বয়সে আমাদের দেশের বৃদ্ধরা গৃহ-কোণে ব'সে বানপ্রস্থের আনন্দ উপভোগ করেন। কিন্তু ইউরোপের লোকেরা আলাদা ধাতের মানুষ। মৃত্যুর আগে পর্য্যন্ত তাদের কাজও ফুরোয় না, খাটুনিও ফুরোয় না। কাউণ্টেরও কাজ বোধ হয় এখনও শেষ হয়নি। এখনও তিনি ঘুরছেন। আমি তাঁকে পরম সমাদরে আমার পাশের চেয়ারে বসালাম।

কাউণ্ট চন্দ্রালোকিত সমুদ্রের দিকে চেয়ে বললেন, চমৎকার শোভা হয়েছে, না ?

বললাম, চমৎকার !

রাশিয়ানেরা ইংরাজের প্রজা নয়। সেজন্যে আমাদের মতো ওদের ছেলেবেলা থেকে এত খেটে ইংরেজি রপ্ত করতে হয় না। কাউণ্ট ইংরেজি জানেন, কিন্তু সামান্য কাজ চলার মতো। ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতেই তিনি আমার সঙ্গে কথা বলছিলেন।

একটু পরে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি নাইরোবি যাচ্ছেন বললেন না ?

—হাঁ। আপনি গেছেন কখনও ?

ভদ্রলোক হাসলেন। চাঁদের আলোয় তাঁর দুটো চোখ চক

চক করে উঠল। বললেন, যমালয় ছাড়া আর যেতে বাকি কোথাও রাখিনি।

আগ্রহে জিজ্ঞাসা করলাম, জায়গাটা কেমন বলুন তো? আমি যাইনি কখনও।

অন্যমনস্কভাবে ভদ্রলোক বললেন, মন্দ নয়।

তারপর হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার শিকারের সখ আছে?

—আছে একটু।

ভদ্রলোক সোজা হয়ে উঠে বসলেন। বললেন, খবর্দ্দার! ওই কাজটি করবেন না! ওইখানে আমি আমার সব চেয়ে ঘণিষ্ঠ বন্ধুকে হারিয়েছি।

—শিকারে গিয়ে?

—হ্যাঁ।

—ওখানে কি সিংহের উৎপাত খুব বেশী?

—সিংহের উৎপাত আছে বটে কিন্তু, সিংহের হাতে তিনি প্রাণ হারান নি।

—তবে?

দূর সমুদ্রের দিকে চেয়ে কাউণ্ট বললেন, কি জানি। সে আমার কাছে আজও একটা রহস্য।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ভদ্রলোক চুপ করলেন। একটু পরে বললেন, তাহ'লে সমস্তটাই বলি শুনুন।

কাউণ্ট বলতে লাগলেন :—

সে অনেক দিনের কথা। রাশিয়া থেকে পালিয়ে সবে

ফ্রান্সে এসেছি। হাতে কোনো কাজ নেই। যাই বলুন জন্ম-ভূমি ছাড়া আর কোথাও দীর্ঘ দিন থাকতে ভাল লাগে না। অল্পদিনের মধ্যেই ফ্রান্স একঘেয়ে হয়ে উঠল। আমি এবং আমার মতো পলাতক আমার এক বন্ধু স্থির করলাম, কিছুদিন বাইরে ঘুরে আসা যাক। কিন্তু কোথায় যে যাওয়া যায়, দুজনের মধ্যে তাই নিয়েই তর্ক-বিতর্ক চলল মাসখানেক। অবশেষে অনেক কথা কাটাকাটির পর স্থির হ'ল, আফ্রিকাই আমাদের উপযুক্ত গন্তব্য স্থান। সেখানে সভ্য মানুষের সঙ্গে সংস্পর্শে আসতে হবে কম, এবং শিকারের সুবিধা প্রচুর। আমার এবং বিশেষ ক'রে আমার বন্ধুর শিকারের সখ অসম্ভব রকম। সুতরাং এ নিয়ে আর বিশেষ আপত্তি উঠল না। আমরা দুজনে একদিন যথাসম্ভব কম লাগেজ, দুটো ভালো রাইফ্‌ল্‌ এবং প্রচুর কার্ট্রিজ নিয়ে আফ্রিকা রওনা হলাম।

নানাস্থান ঘুরতে ঘুরতে পৌঁছুলাম নাইরোবি। ক'দিন সেখানে কাটিয়ে তারপরে আমাদের যাত্রা সুরু হ'ল পশ্চিম দিকে। এদিকে আর ট্রেন নেই। চলেছি কখনও নৌকায়, কখনও ঘোড়ায়, কখনও বা হেঁটে। অবশেষে একটা গ্রামে গিয়ে পৌঁছুলাম। পাহাড়ের গায়ে ক'খানি ছোট কুঁড়ে, এই নিয়ে গ্রাম। এখান থেকে ভিক্টোরিয়া হ্রদ বেশী দূরে নয়। আতিথ্য সৎকারের কোনো ত্রুটি হ'ল না। যাদের আমরা অসভ্য ব'লে ঘৃণা করি তাদের আতিথ্য আর আন্তরিকতা আমাদের অভিভূত ক'রে ফেললে।

সত্যি ক'রে বলতে কি, আমাদের দিন বেশ সুখেই কাটতে

লাগল। ইউরোপের হানাহানি, কাটাকাটি, খবরের কাগজের ঢাকের বাজনা, মোটর গাড়ী, জনকোলাহল থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে মনের মধ্যে কি আনন্দ যে পেলাম সে আর ব'লে বোঝাবার নয়। আমরা হাত পা ও সেই সঙ্গে মনও ছড়িয়ে যেন বেঁচে গেলাম।

এদিকে বোধ হয় সাদা চামড়ার পায়ের ধূলো কোনো দিন পড়ে নি। আমি দেখেছি, যেখানেই এঁরা গেছেন সেখানেই এমন কাণ্ড ক'রেছেন যে, তারপরে যারা গেছে তারা ঘৃণা ছাড়া আর কিছু পায় নি। আমাদের জন্যে ওরা কিন্তু ব্যস্ত হয়ে উঠল। কোথায় বসাবে, কি খাওয়াবে গ্রাম শুদ্ধ লোক তাই নিয়ে ছুটোছুটি করতে লাগল।

সকালে পল্লী থেকে আমাদের জন্যে আসে প্রচুর ফল-মূল মাংস। নাইরোবি থেকে একটি চাকর সঙ্গে এনেছিলাম। যদিচ লোকটা এদেশেরই অধিবাসী, কিন্তু শহরে সভ্য লোকদের সংস্পর্শে এসে রান্নার কাজ কিছু শিখেছে। সুতরাং কিছুমাত্র অসুবিধা আমাদের বোধ করবার কথা নয়, করিও নি। সমস্ত সকাল এবং বিকাল বনে বনে শিকার করি আর সন্ধ্যার সময় কুঁড়ের সামনের উঠানটিতে ব'সে হাওয়া খাই।

বেশ কাটছিল। হঠাৎ—

কথা শেষ না ক'রেই কাউণ্ট চুপ করলেন। তাঁর মুখের ভাব বদলে গেল। চাঁদের আলোয় তাঁর মুখ দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম। মনে হ'ল যেন মরা মানুষের মুখ।

তাঁর রক্তহীন মুখ দেখে আমি অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম। বললাম, তারপর?

ভদ্রলোক আবার যেন ভাল করে ঝেড়ে বসলেন। বললেন, হ্যাঁ। কি বলছিলাম ?

বললাম, শিকারের কথা।

ভদ্রলোক বলতে লাগলেন :

হ্যাঁ। একদিন সকালে দেখি, বন্ধু হেঁট হ'য়ে উঠানের ধূলোয় কি যেন দেখছেন।

জিজ্ঞাসা করলাম, কি দেখছ ?

বললেন, দেখতো এই পায়ের দাগটা কিসের ? এদিকের জঙ্গলে তো সিংহ বড় একটা পাওয়া যায় না। অথচ এত বড় থাবা আর কোন্ জন্তরই বা হ'তে পারে ?

বাস্তবিক তাই। পর পর ক'টি বড় থাবা আমাদের উঠান থেকে বাইরের দিকে চলে গেছে। সিংহ না হোক, সেই রকমই বড় কোনো একটা জানোয়ারের থাবা নিশ্চয়। সিংহের হওয়াও বিচিত্র নয়।

চাকরটাকে ডাকলাম।

থাবার চিহ্ন দেখা মাত্র লোকটা ঠক ঠক ক'রে কাঁপতে লাগল। তার মুখ থেকে সমস্ত রক্ত কে যেন শুষে নিলে। আমরা তাকে ধ'রে ফেলবার আগেই সে আছাড় খেয়ে পড়ল আমার পায়ের উপর। তারপরে পা চেপে জড়িয়ে ধ'রে কাটা জন্তুর মতো কাৎরাতে লাগল আর তাদের দিশি ভাষায় অনর্গল কি যে বলতে লাগল তার এক বর্ণও বুঝলাম না।

হাত ধ'রে তাকে দাঁড় করিয়ে বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করলাম, কি ব্যাপার ?

ভয়ে তখনও লোকটার ভালো ক'রে কথা বার হচ্ছিল না। কোনো রকমে বললে, আর এক মিনিট এখানে থাকা নয়। চলুন পালাই।

—কেন ?

লোকটা থাবার দিকে আঙ্গুল দিয়ে দেখালে।

—কিসের থাবা ওটা ?

—বুজারের।

—বুজার ? সে কি ?

বললে, দেবতা।

আমরা হো হো করে হেসে উঠলাম।

আমাদের হাসি দেখে লোকটা সভয়ে চারিদিকে চাইলে। যেন হাসিটা দেবতার কানে গেল কিনা দেখে নিলে। ব্যাকুল ভাবে আবার বলতে লাগল, চলুন পালাই। এখানে আর এক মিনিট থাকলে মারা যাব।

আমি তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, তোমার কোনো ভয় নেই। আমাদের কাছে রাইফ্‌ল্‌ আছে। তুমি বল বুজার দেখতে কেমন ?

লোকটা ঘাড় নেড়ে বললে, তা কেউ জানে না।

—কেউ দেখেনি ?

—দেবতাকে দেখা যায় না।

—তবে ? কি ক'রে জানলে দেবতা আছে ?

—মাটিতে প্রভুর পায়ের ছাপ পড়ে।

-প্রভু কি মানুষ খান ?

—খান না, কিন্তু যার ওপর চটেন তাকে একেবারে পিষে ফেলেন।

—তুমি কখনও তেমন করতে দেখেছ?

উত্তরে লোকটা কি বলতে যাচ্ছিল। অকস্মাৎ থেমে গিয়ে একটা ভয়-ব্যাকুল আর্ত্তনাদ ক'রে উঠল। চেয়ে দেখি আমার বন্ধু ইতিমধ্যে কখন ভিতর থেকে রাইফ্‌ল্‌ এনে তাক করছেন। সুমুখের উঁচু ঘন ঘাসের জঙ্গলের মাঝখানে ঘাসগুলো যেন কার স্পর্শে নড়ছে। জঙ্গলের ভিতরে কি যে আছে দেখা যাচ্ছিল না। কিন্তু ঘাসগুলো যেভাবে নড়ছিল তাতে বোঝা যাচ্ছিল প্রকাণ্ড কোনো জন্তু তার ভিতর নড়াচড়া করছিল।

এক সেকেণ্ডও নয়। চক্ষের পলকে বন্ধুর রাইফ্‌ল্‌ গর্জ্জন করে উঠল, গুড়ুম্‌। লোকটা সঙ্গে সঙ্গে আছাড় খেয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে বন্ধু ছুটলেন জঙ্গলের দিকে।

কিন্তু তাঁকে জঙ্গলের কাছ পর্য্যন্তও ছুটতে হ'ল না। ঘাসের জঙ্গল দু'ফাঁক ক'রে একটি অদৃশ্য রেখা তীরের মতো বাইরের দিকে বেরিয়ে এল। বন্ধু একটা অস্ফুট চীৎকার ক'রে উঠলেন। তারপরে আমার চোখের সামনে খোলা মাঠে কার সঙ্গে যে তাঁর মল্লযুদ্ধ বাধল কিছুই বোঝা গেল না। বন্ধুর দেহের খানিকটা খানিকটা দেখা যাচ্ছে, আর খানিকটা যেন কিসের আড়াল পড়েছে। কিন্তু বোঝা গেল, কি যেন একটা অদৃশ্য জন্তু তাঁকে জাপটে ধ'রেছে। কার একটা দুরন্ত ফোঁসফোঁসানিও শোনা যাচ্ছে। কে যেন তাঁকে একবার আকাশে তুলছে, একবার মাটিতে আছড়াচ্ছে আর একবার বন বন ক'রে চারদিকে ঘোরাচ্ছে।

বুজার তাহার হাড় পিশিয়া দিয়া অদৃশ্য হ'য়ে গেল (পৃঃ ১১)

এত বড় একটা জন্তু কি উদ্দেশ্যে আমাদের কুঁড়ে ঘর পবিত্র করতে এসেছিলেন কে জানে! কিন্তু আত্মীয়তা করতে নয় নিশ্চয়ই। সিংহই হোক, আর অন্য কোনো জন্তুই হোক আমাদের সতর্ক হতে হয়েছে। কারণ কাছেই নিশ্চয় এর বাসা।

আমি বিস্ময়ে এবং ভয়ে বিহ্বল হয়ে গিয়েছিলাম। কয়েক মুহূর্ত্ত কি যে কর্ত্তব্য ভেবে পাচ্ছিলাম না। জ্ঞান ফিরে আসতে ছুটে গিয়ে নিয়ে এলাম রাইফ্‌ল্‌। কিন্তু যুদ্ধ তখন শেষ হয়ে গেছে। রণভূমি শান্ত স্তব্ধ।

বন্ধুর কাছে গেলাম। তাঁর দেহে জীবনের চিহ্ন পর্য্যন্ত নেই। বুজার তার হাড়গোড় পিষে চট্‌কে সমস্ত দেহকে ময়দার তালের মতো ক'রে রেখে আবার যে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেছে তা'সেই জানে। ভেবে দেখুন, কত বড় বলশালী সেই জন্তু যে একটা বলিষ্ঠ মানুষের দেহ পিষে গুঁড়ো গুঁড়ো ক'রে দিয়ে যেতে পারে মুহূর্ত্ত মধ্যে!

সেইদিনই আমি নাইরোবি যাত্রা করলাম।

কাউন্ট চুপ করলেন।

অস্ফুটকণ্ঠে বললাম, আশ্চর্য্য!

কাউণ্ট ধীরে ধীরে আমার দিকে চাইলেন। অনেক দিন পরে হারানো বন্ধুকে স্মরণ ক'রে অথবা যে কারণেই হোক তাঁর চোখে একটি বিন্দু জল টল টল করছিল।

রুমাল দিয়ে চোখ মুছে বললেন, আশ্চর্য্য কিছুই নয়, মিঃ সেন। এ নিয়ে আমি অনেক ভেবেছি। আমার দৃঢ় ধারণা,

বুজার দেবতা নয়, অশরীরী ভূত-প্রেতও নয়, আস্ত রক্ত-মাংসের দেহধারী জন্তু।

জিজ্ঞাসা করলাম, তবে দেখা গেল না কেন?

কাউণ্ট দেশলাই জেলে গভীর মনোযোগের সঙ্গে একটি চুরুট ধরালেন।

বললেন, এইজন্যে দেখা গেল না যে, অনেক রংই আমাদের চোখে ধরা পড়ে না। যে ক'টা রঙ আমরা জানি তা ছাড়াও রঙ আছে, কিন্তু আমাদের চোখ তা ধরতে পারে না। তেমনি আমাদের কানও সব শুনতে পায় না। মনে করবেন না, হারমোনিয়ামের পর্দ্দায় যে কটা সুর আছে, শব্দের জগতে তা ছাড়া আর সুর নেই। আরও আছে। খাদের দিকেও আছে, চড়ার দিকেও আছে। কিন্তু আমাদের কানের যন্ত্র সে শব্দ ধরবার মতো শক্তিমান নয়। এমন কত শব্দই আমরা শুনতে পাই না, কত রংই যে দেখতে পাই না, তার ঠিকঠিকানা নেই। যে অদৃশ্য জন্তুটির কথা আপনাকে বললাম, তারও এইরকমই কোনো একটা রং হবে। নইলে মাটিতে যার থাবার চিহ্ন পড়ে, যার পেষণে একটা বলিষ্ঠ মানুষ ময়দার তালের মতো হ'য়ে যায়, তাকে দেখতে পেলাম না কেন? আমার কথাটা হঠাৎ বিশ্বাস করতে আপনার বোধ হয় কষ্ট হবে, কিন্তু ভেবে দেখবেন।

কাউণ্ট চুপ ক'রে রইলেন। তারপর জ্বলন্ত চুরুটটা ডেকের বাইরে ফেলে দিয়ে অকস্মাৎ উঠে চ'লে গেলেন।

রাত তখন সাড়ে সাতটা, কি আটটা। বেণু চুপি চুপি দাদুর ফরাসের এক পাশে এসে বসল। এইটে দাদুর আফিঙের মৌতাতের সময়। চাকরটা তামাক দিয়ে গেছে। গড়গড়ার নলটি হাতে ক'রে ধ'রে তিনি একটা তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে ঝিমুচ্ছিলেন। বেণুর পায়ের শব্দ পেয়ে একবার আলগোছে চোখ মেলে চাইলেন।

বেণু খুব ভাল মানুষের মতো বললে, তোমার কলকে নিবে গেছে দাদু। ভুতোকে তামাক দিতে বলব?

দাদু গড়গড়ার নলে আলগা ক'রে দুটো টান দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, কিচ্ছু দরকার হবে না ভাই। কিন্তু তুমি যে এখুনি চলে এলে? মাষ্টার আসেননি?

বেণু দাদুর আরও কাছে এসে বললে, এতক্ষণ বোধ হয় এসে গেছেন। কিন্তু আমার মাথাটা এমন ধরেছে দাদু আর পেটটা এমন কামড়াচ্ছে, আর,—তুমি হেসো না দাদু,—কাণ এমন ভোঁ ভোঁ করছে—

দাদু হেসে বললেন, তা যেন করছে, আর আমিও যেন হাসলাম না। কিন্তু তোমার মা যদি বিশ্বাস না করেন? তখন কি করা যাবে?

বেণু দাদুর আঙুল ধরে টানতে টানতে বললে, ঠিক বিশ্বাস করবে দাদু, তুমি বললেই করবে।

দাদু আর কিছু না ব'লে পরম স্নেহে বেণুর মাথায় হাত বুলোতে লাগলেন, আর চোখ বন্ধ ক'রে তামাক খেতে আরম্ভ করলেন।

একটু পরে বেণু ডাকলে, দাদু!

—কি ভাই?

—ঘুমুচ্ছ?

—না ভাই!

—একটা গল্প বল না দাদু!

দাদু হেসে বললেন, গল্প? গল্প কি আর আছে দাদু ভাই? ব'লে ব'লে সব ফুরিয়ে গেছে। আবার দিন কতক সবুর কর, তবে তো জমবে?

বেণু দাদুর কথা মোটেই বিশ্বাস করলে না। দাদুর গল্পের ভাণ্ডার অফুরন্ত। আবদারের সুরে বললে, হ্যাঁ, ফুরিয়ে গেছে না আরও কিছু। বল না একটা গল্প দাদু! বেশ ভালো মতো একটা বাঘের গল্প!

—বেশ ভালো মতো বাঘ!—দাদু হেসে বললেন,—বাঘ কি কখনও ভালো হয় রে বোকা! বাঘ মাত্রই মন্দ, মানুষ দেখলেই তেড়ে ধরে।

বেণু অপ্রস্তুত হ'য়ে তাড়াতাড়ি হেসে বললে, দূর, তা কেন বলব? ভালোবাঘের কথা তো বলিনি, ভালো একটা গল্পের কথা বলছি।

—ও! ভালো গল্প! তাই বল। কিন্তু বাঘ কি আর বাংলাদেশে আছে দাদু ভাই? শিকারীর উৎপাতে সব দেশ ছেড়ে পালিয়েছে। বাংলাদেশে এখন শেয়ালের ভিড় জমেছে। বাঘ আর নাই।

বেণু বড় বড় চোখ মেলে জিজ্ঞাসা করলে, একটিও বাঘ নেই?

দাদু হেসে বললেন, একটিও থাকবে না কেন ভাই! কিন্তু একটি দুটি নিয়ে কি গল্প জমে? হ্যাঁ, বাঘ দেখে গেছেন আমার বাবা।

কথা শুনে বেণু তো হো হো করে হেসে ফেললে। বললে, তোমার আবার বাবা ছিল নাকি দাদু ভাই? কী সর্ব্বনাশ! তুমিই তো খুনখুনে বুড়ো!

দাদু হাসতে হাসতে বললেন, বুড়ো বলে বাবা থাকবে না? আমি তখন তোমার মতো ছোট্টটি। আমার বাবা ছিলেন তোমার বাবার মতো অমনি। আমি তখন তোমার মতো পড়ায় ফাঁকি দিয়ে এমনি ক'রে দাদুর কাছে গিয়ে বসতাম। আর আমার মা ঠিক তোমার মায়ের মতোই আমার পেটব্যথার কথা কিছুতে বিশ্বাস করতে চাইতেন না। বুঝলে?

আর বলতে হ'ল না। বেণু হেসে ফরাসের উপর লুটোপুটি খেতে লাগল। বললে, রাখো রাখো। ওরে বাবা! শুধু বাবা নয়,

তোমার আবার দাদুও ছিল ! ওঃ ! কি মিছে কথাই তুমি ব'সে ব'সে বানাতে পার দাদু ! হাসতে হাসতে আমার চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে গেল !

বেণুর হাসির শব্দে ঘর ফাটবার উপক্রম হ'ল। সে শব্দে নীচে থেকে তার মা উপরে উঠে এলেন।

দোর গোড়ায় দাঁড়িয়ে বললেন, তোমার আজ পড়াশুনো নেই নাকি, বেণু ? এখানে এসে ওঁকে বিরক্ত করছ কেন ? যাও পড়তে যাও।

মাকে দেখে বেণুর মুখ শুকিয়ে এতটুকু হ'য়ে গেছে। দাদুকে যা খুশী বলা যায়। কিন্তু মাকে তার বড় ভয়। কি যে বলবে ভেবে পেল না। তা দেখে দাদু তাড়াতাড়ি তাকে বুকে জড়িয়ে ধ'রে বললেন, না, না। আজকে আর ও পড়বে না ছোট মা, ওর শরীর ভালো নয়।

ছেলের শরীর ভালো নেই শুনে মায়ের বুকটা ধ্বক্ ক'রে উঠল। শুষ্কমুখে জিগ্যেস করলেন, কি আবার হ'ল ?

—বেশী কিছু নয়। খালি ভয়ঙ্কর মাথা ধরেছে, আর পেট কামড়াচ্ছে, আর কান ভোঁ ভোঁ করছে। আর কি করছে দাদুভাই ?

মা আর দাঁড়ালেন না। হাসি চাপতে চাপতে ভিতরের দিকে পালালেন।

বেণু আরও খানিকক্ষণ চুপ ক'রে দাদুর বুকে পড়ে রইল ! তারপরে যখন মায়ের পায়ের শব্দ সিঁড়িতে মিলিয়ে গেল তখন ভালো ক'রে উঠে ব'সে বললে, তুমি বড্ড ভালো, দাদু, বড্ড

ভালো। এইবার একটা বাঘের গল্প বল। লক্ষ্মী দাদু, তোমার দু'টি পায়ে পড়ি।

দাদু তাকিয়ায় ভালো ক'রে ঠেস দিয়ে বললেন, তা যেন বলছি। কিন্তু গল্পের লোভে রোজ রোজ যেন কান ভোঁ ভোঁ না করে দাদু ভাই! কেমন?

বেণু তৎক্ষণাৎ ঘাড় নেড়ে বললে, আচ্ছা।

দাদু বলতে লাগলেন:

সে অনেক কাল আগের কথা ভাই। বলেছি তো আমি তখন তোমার মতো, আর আমার বাবা তোমার বাবার মতো। তখন ছিল সত্যিকারের বাঘ। এখন তোমরা যাকে বল, রয়াল বেঙ্গল টাইগার।

বেণু কিন্তু কিছুতে বিশ্বাস করতে পারে না, দাদু কোনোকালে তার মতো ছোট ছিলেন। তাঁর তখন পাকা দাড়ি ছিল না। তিনি তখন তামাক খেতেন না। আবার তাঁর শুধু বাবা নয়, একটি দাদুও ছিলেন। তবু গল্পে বাধা হবে ভেবে মুখে কিচ্ছু বললে না, শুধু ঠোঁট বেঁকিয়ে একটু হাসলে।

দাদু বললেন, আমার বাবা তো তোমার বাবার মতো দুর্ব্বল ছিলেন না। তিনি ছিলেন যেমন লম্বা, তেমনি চওড়া। টকটকে রং, টানা টানা চোখ, মাথায় বড় বড় বাবরি চুল। তাঁর ছিল যেমন সাহস, তেমনি শক্তি। তখন আমি তোমার মত অতটুকু। বেশ মনে পড়ে, এক প্রহর রাত থাকতে সবাই উঠেছে। ও ঘরে মা চুপি চুপি কাঁদছেন। বাইরে বারান্দায় ঠাকুমা কাঁদছেন। অকারণে আমিও কাঁদছি। কি? না, বাবা গৌড়ে চললেন।

ক'দিন আগে তিনি স্বপ্ন দেখেছেন, লক্ষ্মীঠাকরুণ তাঁকে গৌড়ে যাবার জন্যে ডাকছেন। সেখানে একটা জঙ্গলের মধ্যে মাটির নীচে নাকি বাদশাহী আমলের বহু ধনরত্ন আছে। জায়গাটা খুঁড়লেই পাওয়া যাবে। লক্ষ্মীঠাকরুণ স্বপ্নে তাঁকে সে জায়গাটাও দেখিয়ে দিয়েছেন, ধনরত্নও। স্বপ্ন ভাঙ্গার পরেও সে সব তাঁর চোখের সামনে জ্বল জ্বল করছে। সবাই কত কান্নাকাটি করলেন। কিন্তু কিছুতে তাঁকে রোখা গেল না। তিনি যাবেনই। অত টাকা মোহরের লোভ তিনি ছাড়তে পারেন না। একটা গুপ্তি, একটি ছোট কাপড়ের পুঁটলী আর সামান্য কিছু টাকা, এই নিয়ে এক প্রহর রাত থাকতেই তিনি বেরিয়ে পড়লেন।

বেণু জিগ্যেস করলে, ভোরেই বুঝি ট্রেন?

দাদু হেসে বললেন, ট্রেন কোথায়? ট্রেনের তখন জন্মই হয় নি। বেশীর ভাগ মানুষ তখন হয় হেঁটে যেত, নয় নৌকোয়।

বেণু ভয়ে ভয়ে বললে, ও বাবা!

—চার মাস পরে বাবা ফিরে এলেন। তখন তাঁকে দেখলে আর চেনা যায় না। রং তামাটে হ'য়ে গেছে, চুলে জট পড়েছে আর চেহারা হ'য়েছে এই রকম, প্যাঁকাটির মতো। তাঁর চেহারা দেখে সবাই কেঁদে সারা।

বেণু জিগ্যেস করলে, ধনরত্ন?

—কিছুই না। চার মাস ধ'রে সমস্ত দিন তিনি কেবল জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে বেড়িয়েছেন। সারাদিনের পর বিকেল বেলা পাশের গ্রাম থেকে কিছু কিনে খেয়ে আবার জঙ্গলে ফিরে আসতেন

ভীষণ শব্দ করে বাঘ মোষটাকে নিয়ে গেল (পৃঃ ১৯)

তারপর সমস্ত রাত একটা বড় গাছের ডালে ব'সে ঠায় জেগে কাটাতেন, যদি কোনরকমে গুপ্ত স্থানের ঠিকানা পাওয়া যায়।

দাদুর বাপের কথায় বেণু আসল কথাটাই ভুলে গিয়েছিল। জঙ্গলের কথায় তাড়াতাড়ি জিগ্যেস করলে, আর বাঘ? দাদু, বাঘ?

দাদু সোজা হ'য়ে উঠে ব'সে বললেন, হ্যাঁ। সেইখানে তিনি দেখেছিলেন সত্যিকারের বাঘ।

বাঘের প্রসঙ্গে বেণুর চোখের তারা স্থির হ'য়ে গেল। বললে, খুব বড়?

—কত বড় শুনবে? ফুট ফুট করছে চাঁদের আলো। নদীর ধারের একটা বড় গাছের ওপর বাবা রাত কাটাচ্ছেন। নীচে, নদীতে একটা বুনো মোষ জল খেতে এসে এমন পাঁকে পড়ে গেছে যে, আর উঠতে পারছে না। তার নাকটা শিং দুটো আর পিঠের খানিকটা মাত্র দেখা যাচ্ছে, আর কিছু না। চাঁদের আলোয় চারিদিকের জল চক্ চক্ করছে, কেবল ওই জায়গাটা অন্ধকার হ'য়ে আছে। থেকে থেকে মোষটা গোঁ গোঁ শব্দ করছে। উপরে ব'সে ব'সে বাবা তার অবস্থাটা দেখছেন। ক্রমেই সেটা পাঁকের মধ্যে ব'সে যাচ্ছে। হঠাৎ একটা ভীষণ গর্জ্জন উঠলো। এত ভীষণ যে, যে গাছটায় বাবা ব'সে সেটা পর্য্যন্ত থর থর ক'রে কেঁপে উঠল। বাবা ভয়ে চোখ বুজলেন। যখন চোখ মেললেন, দেখলেন কোথাও কিছু নেই। বনের গাছগুলো হাওয়ায় তেমনি শন্ শন্ করছে, নদীর জল তেমনি চক্ চক্ করছে। সব ঠিক আছে। কেবল সেই মোষটি নেই।

ভয়ে বেণু দাদুর কাছে ঘেঁসে এসেছে। ভয়ে ভয়ে জিগ্যেস করলে, বাঘ?

—বাঘ। লাফ দিয়ে পড়েছে, প'ড়ে অত বড় একটা মোষকে পাঁকের থেকে অবলালাক্রমে তুলে ডাঙায় ফেলেছে। সেখান থেকে আবার তাকে পিঠে ফেলে কোথায় অদৃশ্য হ'য়ে গেছে। এত কাণ্ড ঘটেছে এক মিনিটের মধ্যে। ভেবে দেখ বাঘটার গায়ে কী ভীষণ জোর!

বেণু শুধু সভয়ে বললে, বাবা!

কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বেণু আবার জিগ্যেস করলে. তারপর?

দাদু গড়গড়ায় টান দিয়ে বললেন, তার পরেই তো আসল গল্প! শোনো। দীর্ঘ দিন ঘুরে ঘুরে অবশেষে বাবা হতাশ হ'য়ে গেলেন। অত বড় জঙ্গল তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজেও স্বপ্নে লক্ষ্মীঠাকরুণ তাঁকে যে জায়গাটা দেখিয়েছিলেন তেমনতর কোন জায়গা তাঁর চোখে পড়ল না। ওদিকে দিনে খাওয়া নেই, রাত্রে ঘুম নেই। যত টাকারই লোভ হোক্ এমন ক'রে না খেয়ে না ঘুমিয়ে মানুষ ক'দিন থাকতে পারে বল? অগত্যা শেষ পর্য্যন্ত তিনি বাড়ীর দিকে রওনা হ'লেন। তিন দিনের পথ হেঁটে এসে একদিন সন্ধ্যার কিছু আগে এক গ্রামে এসে পৌঁছুলেন। চাষীদের ছোট গ্রাম। বাবার গলায় পৈতে দেখে তারা তো সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলে। হাত জোড় ক'রে বললে, দেবতা, রাতটুকু এইখানেই কাটিয়ে যান। সন্ধ্যে হ'তে আর বেশী দেরী নেই। সামনেই তিন-কোশী জঙ্গল। আর যাবেন না। জঙ্গলে বড় বাঘের উপদ্রব।

কিন্তু বাবার তখন বাড়ী ফেরার গোঁ চেপে গেছে। তাতে চেনা পথ। যাবার সময় এই পথেই তো গিয়েছিলেন। বললেন, ভয় কি! সন্ধ্যে হ'তে না হ'তে এ জঙ্গল আমি পেরিয়ে যাব। তিন ক্রোশ বই তো নয়! আর নিতান্তই যদি না পারি, মধ্যে চটি তো আছে। চটিওয়ালাও লোক বড় ভালো। বরং সেইখানেই রাত কাটাব।

তিনি তো বেরিয়ে পড়লেন। কিন্তু তিন ক্রোশ জঙ্গল ওইটুকু সময়ের মধ্যে পার হওয়া কি সহজ কথা! একে জঙ্গল, চারিদিকে বড় বড় আম-জাম-কাঁঠালের গাছে এমনিতেই অন্ধকার। তাতে সন্ধ্যা নেমে আসছে। চটিতে পৌঁছুবার আগেই অন্ধকার ঘোর হ'য়ে উঠল। বাবা কোনোরকমে গিয়ে চটিতে উঠলেন। গিয়ে দেখেন, চটিওয়ালার বাড়ীতে মহা ধুমধাম। অনেক দিন পরে তার জামাই এসেছে। পুকুর থেকে প্রকাণ্ড বড় একটা রুই মাছ ধরা হয়েছে। পাশের গ্রামের হাট থেকে বহু রকমের তরি-তরকারীও আনানো হয়েছে।

সদ্ ব্রাহ্মণ দেখে চটিওয়ালা তো আনন্দে আটখানা। বাবাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম ক'রে বললে, ঠিক দিনে এসে প'ড়েছেন দেবতা। আজ শুভদিনে আমরা আপনার প্রসাদ পাব। আগে বসুন, একটু বিশ্রাম করুন।

জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে একটা চওড়া বাদশাহী সড়ক গেছে। তারই উপর জঙ্গলের মাঝামাঝি জায়গায় এই চটি। চটি মানে একখানা দু' কুঠরী মাটির ঘর। এক কুঠরীর দরজা বাইরের দিকে। অতিথি এলে সেই খানা তাঁর রাত্রিবাসের জন্যে ছেড়ে

দেওয়া হয়। আর একটার দরজা অন্দরের দিকে। সেইটে চটিওয়ালার একাধারে ভাঁড়ার এবং শোবার ঘর। বাইরের বারান্দার একদিকে ভিয়েন চড়াবার উনুন, আর একদিকে একটা তক্তাপোষের উপর মুড়ি-মুড়কি-বাতাসা-পাটালি-চিনির সন্দেশ ইত্যাদি সাজানো থাকে। সেটা দড়ির জাল দিয়ে ঘেরা। তার উপর চটিওয়ালা একটা ভাঙা কাঠের বাক্স নিয়ে ব'সে দোকান করে। কখনো কখনো তার স্ত্রীও বসে। সামনে সরকারী ইন্দারা। ভিতরের দিকেও একটা বারান্দা আছে। তার একদিকটায় হাত দুই উঁচু ক'রে দেয়াল দিয়ে ঘিরে নেওয়া হ'য়েছে। চটিওয়ালার স্ত্রী সেইখানে মুড়ি ভাজে। সামনে একফালি উঠোন। এর বাইরেই ঘন জঙ্গল। পাশেই ছাঁচি বেড়ার ছোট্ট একটুখানি রান্নাঘর। চটিওয়ালার পরিবার বড় নয়। স্ত্রী, একটি মেয়ে আর একটি ছেলে। মেয়েটির বিয়ে হ'য়েছে। ছেলেটি ছোট। বছর দশেক বয়স।

লোকালয় বলতে এই। পথিক ছাড়া আর জনমনুষ্যের সাড়া মিলবে না। এমনি জায়গা।

বেণু নিশ্বাস বন্ধ ক'রে শুনে যাচ্ছিল। জিজ্ঞাসা করলে, বাঘ?

—বাঘ আসছে, দাঁড়াও না।

দাদু বলতে লাগলেন:

মুদীর হাতে তো আর বাবা খেতে পারেন না। কাজেই তাঁকেই রান্নার ভার নিতে হ'ল। ভিতরেই রান্নার জায়গা। রান্না করতে করতে তিনি শুনতে পেলেন, তাঁর সম্বন্ধে চটি-ওয়ালার সঙ্গে তার স্ত্রীর কি যেন চাপাগলায় বচসা হচ্ছে।

বিদেশ বিভুঁই। মানুষকে বিশ্বাস তো নেই! ওদের কথা শোনবার জন্যে বাবা কান খাড়া করলেন।

তিনি যা ভেবেছিলেন তাই। চটিওয়ালা বলছে, বাইরের দিকের ঘরে থাকবেন বাবা, জামাই আর সে নিজে। ভেতরের ঘরে থাকবে মেয়েরা। কিন্তু তার স্ত্রী বলে, সে হ'তেই পারে না। ভেতরের দিকের ঘরে থাকবে মেয়ে-জামাই, বাইরের ঘরে তারা দুজনে আর বারান্দায় ঠাকুর মশায়ের বিছানা ক'রে দেওয়া হবে। গরমের দিন, দিব্যি থাকবেন। বরং একটা মশারি টাঙিয়ে দিলেই বেশ হবে।

চটিওয়ালা বলে, সর্ব্বনাশ! বল কি গো! যা বাঘের উপদ্রব! বামুন-দেবতা মানুষকে বাইরে শুতে দেওয়া যায় কি ব'লে? কত ভাগ্যে উনি এসেছেন। জামাই তো কতবার আসবে।

তার স্ত্রী বলে, হ্যাঁ। বাঘ যেন বাড়ীর আনাচে-কানাচে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বাঘের তো আর কাজ নেই! মশারি টাঙিয়ে দিলে ভয়টা কিসের?

বাবা সমস্ত শুনে মনে মনে হাসলেন। খাওয়া-দাওয়ার পরে চটিওয়ালাকে ডেকে, যেন কিছুই শোনেন নি এমনি ভাবে বললেন, দেখ বাপু, আমি গরম মোটে সইতে পারি না। তার ওপর যে রকম গুরুতর খাওয়া দাওয়া হ'ল, আমার বিছানাটা যেন বাইরে করা হয়।

চটিওয়ালা হাত জোড় ক'রে বললে, সে কি করে হয় দেবতা; এদিকে বড়ই বাঘের উপদ্রব।

কিন্তু চটিওয়ালার স্ত্রী ভিতরে অধীর ভাবে চাবির গোছাটা পিঠে ফেললে।

বাবা হেসে বললেন, আমার জন্যে ভয় করো না। আমি চার মাস গৌড়ের জঙ্গলে কাটিয়া এলাম। বাঘে আমার কিছু করবে না।

সে বেচারা স্ত্রীর ভয়ে আর আপত্তি করতে সাহস করলে না। বাবার বিছানা বাইরেই করা হ'ল। একটা মশারি খাটিয়ে দিলে। বাবা নিশ্চিন্তে মশারির মধ্যে গিয়ে শুলেন। ওরা যে যার ঘরে শুতে গেল। একটু পরেই বাবা আস্তে আস্তে মশারি থেকে বেরিয়ে এসে রাস্তার ধারেই একটা বড় আম গাছ ছিল তার উপর গিয়ে উঠলেন। মশারি যেমন ঢাকা দেওয়া ছিল তেমনি রইল।

বেণু আবার জিগ্যেস করলে, বাঘ?

দাদু হেসে উত্তর দিলেন, বাঘ আবার কিসের? বাবা চুপ ক'রে গাছের উপর ব'সে থাকেন, আর চারিদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেন। বাঘের চিহ্ন মাত্র নেই। অনেকক্ষণ পরে দেখা গেল, দূরে বাদশাহী সড়ক দিয়ে কে যেন একটা লোক দু'হাতে দু'টো লণ্ঠন জ্বালিয়ে আসছে। বাবা আশ্বস্ত হ'য়ে ভাবলেন, বাঁচা গেল। লোকটা কাছে এলে ওকে বসিয়ে একটু তামাক খাওয়া যাবে, দুটো গল্পও করা যাবে। অনেকক্ষণ তামাক না পেয়ে তাঁর মনটা বড় অস্থির হ'য়ে উঠেছিল। লোকটা হেলতে দুলতে আসছে, আসছে, আসছে,—বাবা ক্রমেই আশান্বিত হয়ে উঠেছেন,—আর একটু কাছে আসতেই বাবা চমকে উঠলেন! ওরে বাবা! মানুষ কোথায়!

বেণু তড়াক ক'রে লাফিয়ে দাদুর কোলের উপর ব'সে প্রায় চীৎকার করে বললে, ভূত!

দাদু তাড়াতাড়ি তার গায়ে হাত বুলিয়ে হেসে বললেন, তোমার মাথা!

বেণুর তখনও বুক ধ্বক্ ধ্বক্ করছিল। শুষ্কমুখে বললে, তবে?

দাদু হাসতে হাসতে বললেন, বাঘ।

—বাঘ? তা আলো কেন?

—চোখ দুটো আলোর মতো জ্বলছিল।

কথাটা বুঝে বেণু বললে, হুঁ, তারপরে?

—বাবার তামাক খাওয়ার নেশা তখন মাথায় চড়েছে। মানুষের গন্ধ পেয়ে বাঘটা আমতলায় এসে হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো। বাবাকে দেখতে পেয়ে কিছুক্ষণ উপর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল। কী ভীষণ চোখ! তার পর মাঝে মাঝে লক্‌লকে জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটে, আর আমগাছে গা ঘষে। বাবা গাছের উপর কাঠ হ'য়ে ব'সে আছেন।

এমনি অনেকক্ষণ কাটল।

এমন সময় ভিতরের দিকে দরজা খোলার শব্দ হ'ল। বাবা চেয়ে চেয়ে দেখলেন, জামাতা বাবাজীবন বাইরে এসেছেন। কিন্তু ভয়ে তাঁর তখন এমন শক্তি নেই যে, তাকে তাড়াতাড়ি ভিতরে যেতে বলেন। গলার শব্দ যেন বন্ধ হ'য়ে গেছে। আর সে কতক্ষণের জন্যেই বা! বাবা কিছু ভাববার আগেই একটা বিকট গর্জ্জন ক'রে বাঘটা লাফিয়ে পাঁচীল ডিঙিয়ে ভিতরে পড়ল এবং

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই লোকটিকে মুখে ক'রে নিয়ে বাইরে পড়ে পাশের জঙ্গলে ঢুকে পড়ল।

ওগো, আমার কি সর্ব্বনাশ হ'ল!

চটিওয়ালার মেয়ে আর্ত্তনাদ ক'রে উঠল। সে চীৎকারে বাড়ী শুদ্ধ লোক উঠে পড়ল। চটিওয়ালা ভেবেছিল, বাবাকেই বোধ হয় নিয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি মশারি তুলে দেখছে। সঙ্গে সঙ্গে তার মেয়ে এসে তার পায়ের গোড়ায় আছড়ে পড়ল ;—

বাবা তখনও গাছের উপর ব'সে ব'সে ভয়ে ঠক ঠক ক'রে কাঁপছেন।

নিয়তি আর কাকে বলে!

চটিওয়ালার মেয়ে বার বার স্বামীকে বাইরে যেতে নিষেধ ক'রেছিল। কিন্তু মৃত্যুতে টানছে! বেচারা শোনেনি সে কথা।

কিন্তু চটিওয়ালা বলে, এ সবই তার স্ত্রীর পাপের ফল। বামুন-দেবতাকে অমন ক'রে কখনও কেউ বাঘের মুখে বাইরে শুতে দেয়?

গল্প শেষ হ'য়ে গেছে। বেণুর চোখে তবু পলক পড়ে না। চাকর এসে ডাকলে, খোকাবাবু, খেতে চল। বেণু দাদুকে জড়িয়ে ধ'রে বললে, আমি দাদুর সঙ্গে এইখানে খাব। কিছুতে নীচে যাব না।

অশোক আর রজতে ছেলেবেলা থেকেই খুব ভাব। দুজনের এক বয়স, ছেলেবেলা থেকে এক সঙ্গে এক স্কুলে পড়ে আসছে। রজতের বাবা ব্যারিষ্টার, থাকেন বালিগঞ্জে। আর অশোকের বাবা প্রোফেসার, থাকেন বাদুড় বাগানে। কিন্তু দুজনের মধ্যে বহুকাল থেকে এই নিয়ম চলে আসছে যে, স্কুলের ছুটির পর দুজনে মিলে পালা ধ'রে একদিন যাবে বালিগঞ্জে রজতের বাড়ী, আর একদিন বাদুড় বাগানে অশোকের বাড়ী। সন্ধ্যে পর্য্যন্ত দুজনে একসঙ্গে হাসি, খেলা, গল্প করতে না পেলে অস্থির হয়ে ওঠে।

গেল গ্রীষ্মের বন্ধের আগে অশোক বললে, ছুটির সময় আমাদের দেশের দিকে বেড়াতে যাবে? চল না? কী বারো মাস ক'লকাতায় প'ড়ে থাকো! পাড়াগাঁ দেখে আসবে চলো। কখনো তো দেখনি।

শহরের বাইরে পল্লীগ্রাম দেখবার জন্যে রজতের মন অনেক দিন থেকেই ব্যাকুল হ'য়ে উঠেছিল। কিন্তু নানা কারণে যাওয়া

আর ঘটে ওঠে না। এর আগের বারেও অশোক তাকে নেমন্তন্ন ক'রেছিল। কিন্তু বাবার অনুমতি পেলেও মায়ের অনুমতি কিছুতে পায় নি। তাঁর ভয়, ম্যালেরিয়া। সেই ভয়ে রজতও আর তেমন জোর করেনি। কিন্তু স্কুল খুললে অশোক যখন ফিরল, রজত দেখলে ম্যালেরিয়া তো তার হয়ই নি, বরং স্বাস্থ্য আরও ভালো হ'য়েছে। সেজন্যে এবারে সে ঠিক ক'রেছে যাবেই। তার আরও বেশী লোভ অশোকের বাবার চিড়িয়াখানা দেখবার জন্যে।

অশোকের বাবা প্রাণীতত্ত্বের অধ্যাপক। দেশে একটা বাগান ক'রে বিস্তর সাপ পুষেছেন। গ্লাস-কেসের মধ্যে এমন সাপ আছে যা নাকি কলকাতার চিড়িয়াখানাতেও দুর্লভ। তাঁর কলেজ বন্ধ হ'য়েছে অনেকদিন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি গেছেন চ'লে। সেখানে এই তিনটে মাস তাঁর সাপের সঙ্গেই কাটে। তাতে যে কী আনন্দ পান তিনিই জানেন। অশোকের স্কুল বন্ধ হ'লে অশোক তার মাকে নিয়ে দেশে যাবে।

কি ক'রে রজতের যাওয়া হয় তাই নিয়ে দুই বন্ধুতে অনেক বুদ্ধি পরামর্শ হ'ল। এবং বহু কান্নাকাটি ক'রে রজত তার মায়ের অনুমতি আদায় ক'রে ছাড়লে।

জীবনে প্রথম ক'লকাতার বাইরে এসে রজত যে কী করবে ভেবে পেলে না। এত গাছ, এত লতা, এত ফুল, এত পাখী এমন ধূ ধূ করা মাঠ জীবনে কখনও দেখে নি। নদীর স্রোতের জলে এমন ক'রে সাঁতার কখনও কাটে নি। প্রথম সাতটা দিন তো সাত মিনিটের মতো কখন কেটে গেল জানতেই পারলে না।

তারপরে একদিন সন্ধ্যার সময় মাঠ থেকে বেড়িয়ে ফিরছে, এমন সময় বাইরে থেকেই শুনতে পেলে, অশোকের মা বলছেন, এই জন্যেই তো এখানে আসতে চাই না,—তোমার এই সাপগুলোর উপদ্রবে। কখন যে কাকে কামড়াবে সেই ভয়ে মরি। এত ক'রে বলি ওগুলোকে সাবধান ক'রে রাখবে, তাও তো পারো না। এখানে-সেখানে প্রায়ই তো দেখি একটা না একটা কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে আছে।

ভিতরে এসে দেখলে, অশোকের বাবা একটা মস্ত বড় সাপ ন্যাজ ধ'রে তুলে নিয়ে যাচ্ছেন।

ভয়ে রজতের মুখ শুকিয়ে গেল। বললে, ও কি হে! বাড়ীর ভেতরও সাপ আসে না কি?

অশোক একটা তুড়ি দিয়ে বললে, ও কিছু না। একটা সাপ কি ক'রে পালিয়ে এসেছে বোধ হয়। ওগুলোর বিষ নেই কি না, সেজন্যে বাবা তেমন সাবধানে রাখেন না।

রজতের রীতিমত কুস্তি-করা শরীর। অশোকের মতো টিংটিঙে নয়। তাই ব'লে সাপকে ভয় করবে না? বিরক্তভাবে বললে, না, সাপের আবার বিষ থাকে না!

অশোক বন্ধুর ভয় দেখে হেসে উঠল। বললে, সত্যিই তাই। সব সাপের কি বিষ আছে ভেবেছ? তা নয়। কাল তোমাকে দেখাতে নিয়ে যাব। কত চমৎকার চমৎকার সাপ আছে দেখে তোমার তাক্ লেগে যাবে। যে সাপুড়ে সাপগুলোর তদ্বির করে সে ছিল না কিনা, তাই তোমায় নিয়ে যাই নি। আজ ফিরেছে। কাল দেখবে বড় বড় বিষধর সাপ নিয়ে কি সুন্দর সে খেলা করে।

অশোক আবার হেসে বললে, তোমার আচ্ছা ভয় তো! আমার মায়ের সাহস যে তোমার চেয়ে বেশী!

রজত এই কথায় মনে মনে বিরক্তও হ'ল, লজ্জিতও হ'ল। কিছু না ব'লে ঘরের মধ্যে চলে গেল।

সাপ দেখে সত্যিই রজতের তাক্ লেগে গেল। কোনোটা লাউএর কচি ডগার মতো লিকলিকে। কচি পাতার মতো রং। পাতার সঙ্গে এমন মিশে আছে যে, মনোযোগ দিয়ে না দেখলে দেখাই যায় না। কোনোটার রং ময়ূরের কণ্ঠের মতো চমৎকার। কোনোটা যমুনার জলের মতো চিকণ কালো, কোনোটা ঘিয়ে রঙের। আকারও নানা রকমের। কোনোটা ছ'সাত হাত লম্বা, কোনোটা মাত্র আধ হাত। একটা সাপের আবার দুটো মুখ। তার নাম নাকি রাজসাপ। আর একটা সাপের নাম শঙ্খচূড়। এ নাকি খুব দুর্লভ সাপ, ক্বচিৎ দেখা যায়। অশোকের বাবা বললেন, এগুলো পাহাড় অঞ্চলে গভীর জঙ্গলে থাকে। যেমন হিংস্র, তেমনি বিষধর। আর একটা প্রকাণ্ড বড় পাহাড়ে-সাপ দেখলে যেগুলো ছুটে যেতে পারে না। গাছের ডাল ধ'রে ঝোলে। দেখলে মনে হয় গাছের ঝুরি নেমেছে। কোনো জন্তু কাছ দিয়ে এলেই জড়িয়ে ধ'রে পিষে মেরে ফেলে। বাঘের মতো জন্তুরও নিস্তার নেই। আর একটা সাপ কুণ্ডলীর মধ্যে মুখ গুঁজে ঘুমুচ্ছিল। সাপুড়ে বললে, ওটা এক কুড়ি ল্যাটা মাছ খেয়ে এখন ঘুমুচ্ছে, উঠবে না। বললে, ও বড় ভীষণ সাপ। ঝোঁপের মধ্যে সমস্ত দেহ লুকিয়ে শুধু মুখটি বার করে বসে থাকে। উড়ন্ত পাখী পর্য্যন্ত একবার ওর চোখে চোখ পড়লে

ঝুপ ক'রে মুখে পড়বে। এমন ওর চোখের জ্যোতি। চোখে চোখে পড়লে আর নিস্তার নেই।

কেউটে, গোখুরা, পাহাড়ী চিতা, ডোমনা চিতা, শঙ্খচূড়, লাউডগা, ময়ূরপঙ্খী, বোড়া, চন্দ্রবোড়া, বিষুতে বোড়া, রাজসাপ, শাঁখামুঠি,—হরেক রকমের সাপ দেখে রজতের খুব ভালো লাগল। সাপুড়ে কতকগুলো সাপ নিয়ে যা খেলা দেখালে সেও আশ্চর্য্য। রজত বললে, ফের কালকে আসবে। সব সাপ সে ভালো ক'রে চিনতে চায়। তাদের কথা জানতে চায়।

তার আগ্রহ দেখে অশোকের বাবাও খুব খুশী হ'য়ে জানালেন, তিনি সাপের সম্বন্ধে নিজে যা জেনেছেন তা আনন্দের সঙ্গে রজতকে শেখাবেন। সাপের সম্বন্ধে বন্ধুর ভয় ভেঙেছে দেখে অশোকও খুব খুশী হ'ল।

সেইদিন সন্ধ্যের সময় কি একটা দরকারে অশোককে বাইরে যেতে হ'ল। রজতকেও সে আসবার জন্যে বললে। কিন্তু বাড়ীতে চিঠি লিখতে হবে ব'লে সে আর যেতে পারলে না। অশোক একাই বাইসিকেলে বেরিয়ে গেল।

সন্ধ্যের পরে রজত ডেস্কের সামনে ব'সে চিঠি লিখতে লাগল। অনেকখানি লেখা হয়েছে এমন সময় কি একটা কথা ভাববার জন্যে মাথা তুলতেই নজরে পড়লো, খাটের নীচে কি যেন দুটি বিন্দু চিকচিক করছে। একটি বিন্দু থেকে আর একটি বিন্দু ইঞ্চখানেক তফাতে। খাটের নীচেটা অন্ধকার। ভালো ক'রে কিছু এত দূর থেকে দেখা যাচ্ছিল না। হয়তো তার চটির ওপরকার পেরেকের ওপর আলোর ছটা পড়েছে ভেবে সেটাকে

আর গ্রাহ্যের মধ্যেই আনলে না। আবার লিখতে আরম্ভ করল। কিন্তু একটু পরেই কি ভেবে আবার মুখ তুললে। দেখলে সেই দুটি বিন্দু এখনও তেমনি চিকচিক করছে। বরং আরও বেশী। এবারে তা থেকে কেমন একটা নীলাভ জ্যোতি বেরুচ্ছে, যা আগে দেখেনি। মনে হ'ল, আরও ইঞ্চিখানেক তার দিকে এগিয়েও এসেছে। কিন্তু অন্ধকারে ভালো ক'রে সবটা দেখা যাচ্ছিল না। সে আবার লেখায় মন দিলে।

কিন্তু তখনই কি মনে পড়ায় হঠাৎ সে শিউরে উঠল। চেয়ার থেকে ওঠবার জন্যে তৈরী হ'য়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে খাটের নীচে তাকালে। এবারে মনে হ'ল, বিন্দু দুটো যেন আরও বেশী চক্‌মক্ করছে। আরও তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখলে। আবছা অন্ধকারেও বোধ হ'ল কি যেন একটা দড়ির মতো কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে রয়েছে। রজতের আর বিন্দুমাত্রও সন্দেহ রইল না যে, ঘরে সাপ ঢুকেছে, প্রকাণ্ড বড় একটা সাপ। কুণ্ডলীর ভিতর থেকে তার দিকে মুখ বের ক'রে রয়েছে। বিন্দু দুটো চোখ। এখন আর নিরর্থক চিক্‌চিক্ করছে না। কি যেন একটা ভয়ঙ্কর গূঢ় উদ্দেশ্য নিয়ে মিটি মিটি চাইছে। রজত চেয়ারের হাতলটা মুঠোর মধ্যে শক্ত ক'রে চেপে ধরল।

ভয়ে রজতের মুখ শুকিয়ে গেল। এবং ওই সরীসৃপটাকে দেখে কেমন একটা ঘৃণায় তার শরীর শিরশির ক'রে উঠল। একবার ইচ্ছা হ'ল চীৎকার ক'রে ওঠে। কিন্তু পারল না,— ভয়ের জন্যও বটে, তা ছাড়া লজ্জাতেও। কাল সকালেই অশোক তাকে প্রকারান্তরে মেয়েমানুষেরও অধম ব'লে ঠাট্টা করেছিল।

কপালে যা ঘটে ঘটুক, কিন্তু তাকে যে এই নিয়ে যাবজ্জীবন ঠাট্টা সহ্য করতে হবে সে অসহ্য। আবার ভাবলে, সাপটা এখন চুপ ক'রে প'ড়ে আছে বটে, কিন্তু তার চীৎকারে যদি বুঝতে পারে ভয় পেয়েছে, হয়তো তেড়ে এসে কামড়ে দেবে, কিংবা জড়িয়ে ধরবে। প্রাণীদের স্বভাবই তাই।

কিন্তু এটা কি সাপ? রজত চিনতে পারলে না। কত বড় তাই বা কে জানে! অন্ধকারে ঠাওর করা যায় না। যতদূর বোধ হচ্ছে তার উপর-হাতের মতো মোটা নিশ্চয়ই। বিষ আছে? না, পাহাড়ী-সাপের মতো জড়িয়ে ধরে পিষে মারে? শঙ্খচূড় হ'তে পারে, পাহাড়ী চিতাও হ'তে পারে। অন্ধকারে কিছুই ভালো ক'রে বোঝা যায় না। আর যদি বড় ঢোঁড়াও হয়, তাহ'লেও ওই বিশ্রী কিল্‌বিলে সরীসৃপটার সঙ্গে এক ঘরে থাকতে হবে, ভাবতেও শরীর ঘিন্‌ ঘিন্‌ করে ওঠে। এই বাতাসে ওর বিষাক্ত নিশ্বাস এসে পড়ছে, সেই বাতাস তাকেও তো নিতে হচ্ছে।

রজত কোনো রকম শব্দ না ক'রে উঠে দাঁড়াল। ভাবলে অতি সন্তর্পণে সাপটাকে এতটুকু বিরক্ত না ক'রে আস্তে আস্তে পিছু হ'টে পালাবে,—যেমন ক'রে মানুষ বাদশার কাছ থেকে আসে। সেও তো এই। যার হাতে শক্তি আছে, তাকে মানুষ ভয় পায়। ভয় পেলে এমনই সসম্ভ্রমে পিছু হটে আসে। পিছু হটে এসেও দরজা খুঁজতে তার কিছু অসুবিধা হবে না। তবু যদি সাপটা তার সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে আসে, দরজার পাশেই ডানদিকে যে বল্লমটা আছে তাই দিয়ে লড়তে পারে। পিছন

দিকে না তাকিয়েও রজত যা যা করবে সব যেন মনের চোখে দেখতে পেলে।

আস্তে আস্তে সে ডান পা'টা তুললে। অমনি সাপের চোখ দুটো হিংস্রভাবে চক্ চক্ ক'রে উঠল। রজত পা তুলেছিল আবার নিঃশব্দে নামালে। না, পালানো চলবে না। অশোক তাকে মেয়েমানুষেরও অধম ব'লে ঠাট্টা ক'রেছে। সত্যিই তো আর ভীতু সে নয়। ছেলেবেলা থেকে মুগুর ডাম্বেল ভেঁজে শরীর তার লোহার মতো শক্ত। ভয়ও সে কাউকে করে না। অশোক এসে এখন একবার নিজের চোখে দেখুক কী ভীষণ তার সাহস।

রজত মনে মনে ভাবলে স্কুলের সবাই আমাকে সাহসী ব'লে জানে। এখানে কেউ উপস্থিত নেই। যদি আমি পিছু হ'টে পালাই কেউ অবশ্য দেখতে পাবে না। কিন্তু সেই কি সত্যিকার সাহস হ'ল? কেউ দেখতে পাক আর না পাক, কিছুতে তার পালানো হবে না।

রজতের সমস্ত দৃষ্টি সাপের চোখের ওপর।

তার নিজের অজান্তেই ডান পায়ের হাঁটুটা একটু বেঁকলো, তারপরে পা'টা উঠলো এবং আস্তে আস্তে বাঁ পায়ের আধ হাত আগে এসে পড়ল। তারপরে আবার বাঁ পায়ের হাঁটুটা বেঁকলো, পা'টা উঠলো, আস্তে আস্তে ডান পায়ের আগে এসে পড়ল। হাত দুটো তখনও পিছন দিকে সোজা হয়ে চেয়ারের হাতল দুটো শক্ত ক'রে চেপে ধ'রে। দেখলে মনে হয়, হাতল ছাড়বার ইচ্ছা নাই। হাত দুটো সেইখানে রেখেই সে আস্তে আস্তে একটুও শব্দ না ক'রে এগুতে লাগলো।

সাপটা তখনও নিশ্চলভাবে প'ড়ে, অবিকল আগের মতো। কেবল চোখ দুটো বৈদ্যুতিক স্ফুলিঙ্গের মতো অসম্ভব জ্বলছে। রজতের আর চোখের পলক পড়ে না। মুখ তার ছাইএর মতো সাদা হ'য়ে গিয়েছে। সে একদৃষ্টে সেই আশ্চর্য্য চোখওয়ালা সাপের দিকে চেয়ে রইল।

রজত আর এক পা এগুলো। তারপরে আরও এক পা। তার হাতের টানে চেয়ারের পেছনটা উঠে পড়েছে। এমন সময় হঠাৎ হাতের মুঠো আলগা হয়ে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে শব্দ ক'রে চেয়ারটা পড়ে গেল। সে শব্দে রজত একটা অস্ফুট আর্ত্তনাদ ক'রে উঠলো।

কিন্তু তথাপি সাপটা একটুও নড়ে না। কেবল চোখ দুটো আরও জ্বল্‌জ্বল্‌ হ'য়ে ওঠে। চেয়ারের শব্দে তার চোখ দুটো যেন দুটি সূর্য্যবিন্দুর মতো ঝক্‌ঝক্‌ ক'রে উঠলো। সেদিকে আর চাওয়া যায় না। অথচ রজতের পক্ষে তার চোখের থেকে চোখ ফিরিয়ে নেওয়ারও সাধ্য নেই। রজত শুধু মন্ত্র মুগ্ধের মতো এগিয়ে চলে, যেন সে চোখ তাকে প্রচণ্ড বেগে নিজের দিকে আকর্ষণ করছে।

আশ্চর্য্য সে চোখ! জলে ঢিল ফেললে যেমন প্রথমে একটা ছোট ঢেউএর বৃত্ত, তারপরে ক্রমে বড় হ'তে হ'তে জলের সঙ্গে মিলিয়ে যায়, এও তেমনি। তার চোখ দুটো যেন মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে বুদ্বুদ কাটছে। সেই আলোর বুদ্বুদ ফেটে ফেটে পড়ছে। আর আলোর বৃত্ত যেন বড় হ'তে হ'তে একেবারে তার মুখেরই কাছে এসে মিলিয়ে যাচ্ছে। তার বুক ঢিপ্‌ ঢিপ্‌ করছে।

কিন্তু তার মনে হচ্ছে দূরে কোথায় যেন জগঝম্প বাজছে। আর কান ভোঁ ভোঁ করছে, মনে হচ্ছে খুব দূরে কে যেন আস্তে আস্তে বাঁশী বাজাচ্ছে।

ধীরে ধীরে গান-বাজনা বন্ধ হ'য়ে গেল। রজতের মনে হ'ল একসঙ্গে রোদ-বৃষ্টি আরম্ভ হ'য়েছে। চারিদিক ঝাপ্‌সা, কিন্তু আশ্চর্য্য উজ্জ্বল। তারই মধ্যে যেন অনন্তশয্যায় সাপ অসংখ্য পাকে পাকে জড়িয়ে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। তার মাথার ওপর একটা প্রকাণ্ড মণি ঝক্‌ঝক্ করছে। তারপরে থিয়েটারের ড্রপসিন যেমন ক'রে গুটিয়ে যায়, দেখতে দেখতে সমস্ত যেন তেমনি ক'রে গুটিয়ে গেল। চারিদিক অমাবস্যার রাত্রির মতো অন্ধকার। অকস্মাৎ কিসে যেন তার মুখে আর বুকে ছোবল মারলে। রজত একটা চীৎকার ক'রে সেইখানে পড়ে গেল।

অশোকের বাবা ছিলেন পাশের ঘরে, আর মা রান্নাঘরে। চীৎকার শুনে দুজনেই ছুটে এলেন। ভয়ে তাঁদের মুখ বিবর্ণ হ'য়ে গেছে। এসে দেখেন খাটের নীচে রজত অজ্ঞান হ'য়ে প'ড়ে। তাঁর ঠোঁট কেটে ঝরঝর ক'রে রক্ত পড়ছে। অশোকের মা তার মাথা কোলে ক'রে নিয়ে বসলেন। গ্লাসে জল ছিল, তাই তার মুখে মাথায় চোখে ঝাপটা দিতে রজতের জ্ঞান হ'ল। সে অবাক হ'য়ে ফ্যালফ্যাল ক'রে দুজনের মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখে, কিন্তু কিছুতে যেন বুঝতে পারছে না ব্যাপারটা কি হয়েছে।

হঠাৎ অশোকের বাবার খাটের নীচে দৃষ্টি পড়লো। হেঁট

হ'য়ে সেটাকে টানতে টানতে বললেন, এটা এখানে এল কি ক'রে ?

রজতের ঠোঁটের রক্ত তখন বন্ধ হয়েছে। অশোকের মা কাপড়ের খুঁট দিয়ে পরম স্নেহে তার কপালের জল মুছিয়ে দিচ্ছিলেন। অশোকের বাবার কথায় জিজ্ঞেস করলেন, কি ওটা ?

সেটাকে বাইরে টেনে এনে অশোকের বাবা বললেন, অশোকের মাসীমা সেদিন তাকে যে রবারের সাপটা দিয়েছিলেন সেইটে।

তিনি সেটা নিয়ে গিয়ে সামনের বড় আলমারীর মাথার উপর তুলে রেখে দিলেন।

রজতের তখন বেশ জ্ঞান হ'য়েছে। অশোকের বাবার কথা শুনে লজ্জায় বেচারা চোখ বন্ধ করলে। ছিঃ ছিঃ! শেষকালে একটা রবারের সাপ দেখে এই কাণ্ড! সবাই তাকে জিজ্ঞেস করতে লাগলেন, কী হ'য়েছিল তার ? সে কিছুই উত্তর দেয় না।

তখন সকলে অনুমান করলে, তার নিশ্চয়ই ফিটের অসুখ আছে।

অনেক কাল আগের কথা। তখনও গ্রামে গ্রামে পাশ করা ডাক্তারের এত প্রাদুর্ভাব হয়নি,—অন্ততঃ কুমারহাটিতে হয়নি। এখানে বড় বড় কার্ব্বাঙ্কল থেকে ছোট ছোট ঘা ফোড়া পর্য্যন্ত সকল রকম অস্ত্র-চিকিৎসা করতো মধু পরামাণিক। আর জ্বর জ্বালায় ওষুধ দিতেন হংসেশ্বর ডাক্তার। পাশ-করা ডাক্তার তিনি ছিলেন না, কিন্তু পসার ছিল যথেষ্ট। কারণ এদিকে দশ-পনেরো মাইলের মধ্যে তিনিই একম্ এবং অদ্বিতীয়ম্। বেঁটে খাটো মানুষ। মাথায় কাঁচা পাকা চুল ছোট ছোট ক'রে ছাঁটা। তার মাঝখানে একটি পরিপুষ্ট শিখা। গলায় তুলসীর মালা। গ্রামের রোগী দেখতে এক জোড়া মুচে চটি এবং একখানা চাদরই যথেষ্ট। বাইরে বেরুতে হ'লে একটা পিরান নিতেন। সূতির চাদরটাও বদলে মট্‌কা ব্যবহার করতেন। আর পায়ে দিতেন চীনে বাড়ীর জুতো।

এত পসার সত্ত্বেও ভদ্রলোক কিন্তু বিশেষ টাকা জমাতে পারেন নি। প্রথমতঃ তাঁর ফী বলে কিছু ছিল না। দু পাঁচজন ধনী রোগী ছাড়া বাকী প্রায় সর্ব্বত্রই আলুটা বেগুণটা নিয়েই সন্তুষ্ট হতে হতো। ওষুধটা পর্য্যন্ত বিনামূল্যে। এ হেন ভালো মানুষ ভদ্রলোক একদিন কি বিপদে পড়েছিলেন সে যদি শোনো তোমাদের গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠবে।

সন্ধ্যে বেলায় পাশের গ্রাম থেকে একটা ডাক্ এলো, না গেলেই নয়। রোগীর অবস্থা শুনে ডাক্তারবাবু না বলতে পারলেন না। দূর অবশ্য বেশী নয়। দুটি গ্রামের মধ্যে মাইল চারেকের একটা বিলের ব্যবধান। এই বিলটা সম্বন্ধে চারি-পাশের লোকের অনেক কালের ভয় আছে। বিশেষ ক'রে বিলের মাঝামাঝি জায়গায় যে বহুকালের বুড়ো বটগাছটা আছে সেখানে·যে অসংখ্য ভূতের বাস তাতে আর কারো সন্দেহ নেই। কিন্তু রোগীর বাড়ীর লোক যখন ভরসা দিলে যে, তারা নিজে তাঁকে পৌঁছে দিয়ে যাবে তখন আর ভয় করবার কি আছে! তিনবার দুর্গানাম স্মরণ করে হংসেশ্বর ডাক্তার ভর সন্ধ্যাবেলাতেই বেরিয়ে পড়লেন।

রোগী দেখে, ওষুধের ব্যবস্থা ক'রে যখন ফিরলেন তখন রাত দশটার বেশী নয়। ফুট্‌ফুটে জ্যোৎস্না উঠেছে। তার ওপর সঙ্গে আলো নিয়ে আসছে দুজন বিখ্যাত লাঠিয়াল। ডাক্তারবাবু নির্ভয়ে খোস গল্প করতে করতে চলে আসছেন। বরং বেশ ভালোই লাগছিল। যে বটগাছটার সম্বন্ধে সকলেরই ভয়, তারই নীচে দিয়ে আসতে ভয়ে তাঁর গা ছম্ ছম্ করলেও কেমন একটু

গর্ব্বও বোধ করছিলেন। এমনি করে আসতে আসতে যখন প্রায় গ্রামের সীমানায় এসে পৌঁচেছেন, আর মাত্র মাইল খানেক বাকী, হঠাৎ একটা মস্তবড় ঘোড়া ছুটতে ছুটতে এসে প্রায় তাঁর গা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে পড়লো। এত রাত্রে হঠাৎ একটা ঘোড়া দেখে এঁরা তিন জনেই চমকে উঠলেন।

ডাক্তারবাবু অবাক হয়ে সঙ্গের লোকদের জিগ্যেস করলেন, কার ঘোড়া হে ? চমৎকার ঘোড়াটি তো !

একজন ঘোড়াটিকে ভালো ক'রে দেখে বললে, সম্ভব মদন-পুরের বাবুদের। তাঁরা একটা নতুন ঘোড়া কিনেছেন শুনেছি। বোধ হয় সেইটে।

আর একজন বললে, জিন্ লাগাম পরানো। হয়তো রাস্তায় কোথায় সওয়ার ফেলে দিয়েছে।

ডাক্তারবাবুর ঘোড়ার খুব সখ। তিনি ঘোড়াটার গায়ে আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে বললেন, কিন্তু দুষ্টু ঘোড়া বলেতো বোধ হচ্ছেনা।

একে ঘোড়ার সখ, তার উপর সমস্ত দিন হেঁটে হেঁটে তাঁর পায়ের আর কিছু ছিল না। ঘোড়াটি দেখে লোভ হচ্ছিল। এটায় চড়ে যেতে পারলে আর এই মাইল খানেক হাঁটার দুর্ভোগ ভুগতে হয়না।

একজন সঙ্গী তাঁর মনের ভাব বুঝে বললে, যাবেন নাকি এইটাতে চড়ে ? কাল সকালে খোঁজ করতে এলে ফিরিয়ে দিলেই চলবে।

ডাক্তারবাবু মনে মনে লোভে উসখুস করলেও প্রকাশ্যে একটু

ইতস্ততঃ ক'রে বললেন, সে কি হয়! কার-না-কার ঘোড়া। হয়তো বলবে—"

চোখ পাকিয়ে লাঠিয়াল সঙ্গী বললে, বললেই হ'ল! আমরা কি চুরি করছি নাকি? যান্‌তো চলে, যা হয় সে আমরা বুঝব।

বলে ছাতি ফুলিয়ে দুটো ঘুঁসি মারলে। আসল কথা এতে তাদেরও স্বার্থ ছিল। এইখান থেকে ডাক্তারবাবুকে ঘোড়ায় উঠিয়ে বিদায় করতে পারলে আর তাদের গ্রাম পর্য্যন্ত যেতে আসতে হয় না।

ডাক্তারের নিজের তাগিদও কম নয়। সকাল সকাল বাড়ী ফেরা নিতান্তই প্রয়োজন। দুজন বিখ্যাত লাঠিয়ালের ভরসা পেয়ে আর দ্বিধা করলেন না। টপ করে ঘোড়ায় উঠে বসলেন। ঘোড়া আস্তে আস্তে গ্রামের দিকে চলতে লাগল। তা দেখে লাঠিয়াল দুজন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে নিজেদের গ্রামের দিকে ফিরে চলল।

* * * *

ডাক্তারবাবু এককালে বেশ ভালো ঘোড়সওয়ার ছিলেন। এখনও ঘোড়া দেখলে তাঁর পা সুড় সুড় করে। অনেক দিন পরে ঘোড়া পেয়ে তাঁর ইচ্ছা হ'ল একটা ভালো ছার্ত্তক দেন। হাতে চাবুক ছিল না, ছিল একটা ভাঙ্গা ছাতা। সেইটা দিয়ে আঘাত করতেই ঘোড়াটা তীরের মতো ছুটলো। বহু ঘোড়ায়

এককালে তিনি চড়েছেন, অনেক বদখেয়ালী তেজী ঘোড়া সায়েস্তা করেছেন। কিন্তু কোনো ঘোড়া যে এত জোরে ছুটতে পারে এ তাঁর ধারণাই ছিল না। থামাবার জন্যে তিনি বহু চেষ্টা করলেন! কিন্তু কিছুতে থামানো যায় না। ঘোড়া তীরের মতো হাওয়া কেটে ছোটে। মনে হ'ল মাটিতে যেন তার পা ঠেকছে না। এক একখানা গ্রাম চক্ষের নিমেষে পাশ কেটে চলে যাচ্ছে।

বিলের রাস্তা—অর্থাৎ রাস্তা বলে কিছু নেই। কেবল বাবলার বন। তারই মধ্য দিয়ে ঘোড়া বিদ্যুৎবেগে কোন্ দিকে যে ছুটছে, ডাক্তারবাবু কিছুই ঠিক করতে পারলেন না। কেবল বাবলার বনের মধ্য দিয়ে ছুটতে দেখে মাথা নীচু করে ঘোড়ার গলাটা জড়িয়ে ধরলেন। হঠাৎ একটু ভরসা হ'ল কিছুদূর আগে নদী দেখে। তিনি অনুমান করলেন, রূপসী নদী। কারণ এদিকে আর বড় নদী নেই। চাঁদের আলোতে নদীর জল চক্‌চক্ করছিল। তা দেখে ভরসা হ'ল এইবার ঘোড়াকে থামতে হবে। রূপসী প্রকাণ্ড বড় নদী। জলও যথেষ্ট। কিন্তু এটুকু ভাবতে তাঁর যতখানি সময় লাগল ততক্ষণে ঘোড়া নদীর ওপারে পৌঁচেছে। এতক্ষণ পর্য্যন্ত ডাক্তারবাবুর জ্ঞান ছিল। কিন্তু ঘোড়া লাফিয়ে নদী পার হ'ল, কি ক'রে বুঝতে পারলেন না। ভয়ে তাঁর সমস্ত শরীর কুঁকড়ে গেল। তিনি চোখ বন্ধ করলেন।

এমনি করে কতক্ষণ চলেছিলেন, জানেন না। হঠাৎ এক সময় দেখলেন প্রকাণ্ড বড় এক রাজবাড়ীর দেউড়ীর ভেতর দিয়ে এসে গাড়ী-বারান্দায় ঘোড়া থেমে গেল। সঙ্গে সঙ্গে একজন

চাকর এসে ঘোড়ার লাগাম চেপে ধরলে এবং আর একজন তাঁকে পরম সমাদরে নামতে ইঙ্গিত করলে। ডাক্তারবাবুর তখন জ্ঞান ছিল বলা চলে, ছিলও না বলা চলে। তিনি চোখ মেলে সব দেখছিলেন এবং কান দিয়ে সব শুনছিলেন, কিন্তু কিছুই পরিষ্কার ক'রে বুঝতে পারছিলেন না। চাকরের ইঙ্গিত মত তিনি তার পিছু পিছু বড় হলঘরের বারান্দায় গিয়ে উঠলেন। সঙ্গে সঙ্গে আর একজন চাকর পা ধোয়ার জল, গামছা নিয়ে এল। ডাক্তার-বাবু হাতমুখ ধুয়ে অনেকটা সুস্থ হ'লেন। তারপরে হলঘরে গিয়ে বসলেন।

মস্ত বড় হল। নীচে ঘরজোড়া ফরাস পাতা। অনেকগুলো তাকিয়া এখানে ওখানে ছড়ানো। ওপরে ঝাড়ের আলোয় সমস্ত ঘর যেন ঝলমল করছে। আর সেই ঘরের মধ্যখানে একটি বৃদ্ধ ভদ্রলোক চোখ বন্ধ ক'রে নীরবে আলবোলা টানছেন। তাঁর মাথায় প্রকাণ্ড বড় টাক, ঝাড়ের আলোয় চক্‌মক্ করছে। পাকা আমের মত টুক্‌টুকে রঙ। গায়ে একটা ফিন্‌ফিনে হাত-কাটা বেনিয়ান,—বাঁ হাতে সোনার তাগাটা দেখা যাচ্ছে। পরণে দামী একখানা ধুতি। কেমন যেন বিমর্ষভাবে বসে আছেন। ডাক্তারবাবুর দিকে একবার তাকিয়েই নীরবে ঘাড় নেড়ে বসতে বললেন। তাঁর চোখের দিকে তাকিয়ে ডাক্তারবাবু নিজের অজান্তেই শিউরে উঠলেন। মরা ছাগলের মত এমন ঘোলাটে চোখ মানুষের দেখা যায় না। সে দৃষ্টিতে তাঁর হাড়ের ভিতর পর্য্যন্ত বরফের মত ঠাণ্ডা হয়ে গেল। তিনি তাড়াতাড়ি চোখ ফিরিয়ে নিলেন।

ঘর নিস্তব্ধ।

কেবল দেওয়ালের বড় ঘড়িটা অশ্রান্তভাবে টিক্ টিক্ করছিল। ডাক্তারবাবু চেয়ে দেখলেন, রাত্রি মোটে বারোটা বেজে পাঁচ।

ভয় করবার কিছু নেই। এতক্ষণ মাঠে মাঠে ঘুরছিলেন, এখন বরং লোকালয়ে ভদ্রলোকের আশ্রয়ে এসে পৌঁচেছেন। তবু কেমন একটা অজানা ভয়ে তাঁর গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল। একগ্লাস জলের জন্য কাকে বলা যায় ভেবে এদিক ওদিক চাইতেই একটা চাকর এসে রূপার গ্লাসে এক গ্লাস শরবৎ এনে তাঁর সম্মুখে নামিয়ে দিলে। ডাক্তারবাবু খুশী হ'য়ে তার দিকে চাইতেই তার চোখে চোখ পড়ে গেল। ভদ্রলোক চমকে উঠলেন। তাঁর হাত কেঁপে উঠল। আশ্চর্য্য! এরও চোখ তেমনি ঘোলাটে!

কিন্তু তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যাচ্ছিল। তিনি ঢক্ ঢক্ করে এক নিঃশ্বাসে শরবতটা পান করে ফেললেন। আঃ! এমন চমৎকার শরবৎ তিনি কখনও খাননি। শরীর যেন জুড়িয়ে গেল। তখনই আর একজন পানতামাক নিয়ে এল। ডাক্তার-বাবু তার চোখটা কিরকম দেখবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু লোকটা যেন তাঁর মনের মতলব বুঝতে পেরে ফিক্ করে একটু হেসে চোখ নামিয়ে সরে গেল। ডাক্তারবাবু আর কিছু না ব'লে একটা পান মুখে দিয়ে তামাক টানতে লাগলেন। কোথাকার তামাক এটা? চমৎকার তামাক! খেতে খেতে সুখে চোখ বুজে আসে!

সেই বুড়ো ভদ্রলোক তখনও একমনে তামাক টেনেই চলেছিলেন। কিন্তু একটা কথাও বলছিলেন না। বাইরে বহু লোক জন যাওয়া-আসা করছিল। কিন্তু তাদেরও কারও মুখে হাসিও নেই, কথাও নেই। আরও একটা আশ্চর্য্যের বিষয়, ডাক্তারবাবু যারই দিকে চেয়ে দেখেন, সবাই চোখ নামিয়ে চলেছে। এতগুলো লোক যে এ বাড়ীতে রয়েছে তা চোখে না দেখলে বোঝা যায় না। কথাতো কেউ বলছেই না, এমন কি তাদের পায়ের শব্দ পর্য্যন্ত পাওয়া যাচ্ছে না। ডাক্তার বাবুর মনে হ'ল, এ বাড়ীতে হয়ত কারও কঠিন অসুখ করেছে। হয়ত এখন-তখন অবস্থা। ব্যাপার দেখে কর্ত্তা বাইরে এসে গালে হাত দিয়ে বসেছেন। লোকজনের মুখ দিয়ে আর কথা সরছে না।

কিন্তু তিনি বুঝতে পারছিলেন না এ বাড়ীটা কাদের হতে পারে। এঁরা যে রাজা বিশেষ লোক তাতে আর সন্দেহ নেই। এদিকের বিশ, পঁচিশ মাইলের ভেতর প্রত্যেক গ্রাম কখনো না কখনো কোনো না কোনো উপলক্ষে তিনি দেখেছেন। ঘোড়া তাঁকে দু-ঘণ্টার মধ্যে এখানে এনে ফেলেছে। যত জোরেই ছুটুক, দু'ঘণ্টায় আর কতই বা রাস্তা যাওয়া যায়? বহু চেষ্টা ক'রেও এ বাড়ী ডাক্তার বাবু আর কখনও দেখেছেন বলে মনে করতে পারলেন না। ব্যাপারটা বুড়ো ভদ্রলোককে জিগ্যেস করবেন মনে করছেন, এমন সময় খাবার ডাক এল। ডাক্তার বাবু খেতে গেলেন।

খাবারের আয়োজন দেখে ডাক্তার বাবুর চক্ষু স্থির। প্রকাণ্ড

বড় সোনার থালায় খান কয়েক ফুলকো লুচি। আর তার চারিদিকে কত যে তরকারী থরে থরে সাজান, গরীব ডাক্তার বাবু কখনো তা চক্ষেও দেখেন নি। রাত হয়েছে, অতিরিক্ত পথশ্রমে ক্ষুধাও কম লাগেনি। তিনি আর কালবিলম্ব না ক'রে ব'সে পড়লেন।

খেতে বসেই মনে হ'ল, সবই আছে বটে কেবল এক টুকরা লেবু আর নুন নেই। কথাটা তাঁর মনে উদয় হওয়া মাত্র ঠাকুর এসে একটা রেকাবীতে ক'রে নুন আর লেবু রেখে গেল। সব রান্নাই চমৎকার হয়েছিল, বিশেষ করে তপ্‌সে মাছ ভাজা বড় ভালো লাগলো। এদিকে তপসে মাছ পাওয়া যায় না। ভদ্রলোক কি করে কোথা থেকে জোগাড় করলেন কে জানে!

ডাক্তার বাবুর মনে মনে হাসি পেল যে, ভদ্রলোক এত কষ্ট করে দুষ্প্রাপ্য তপ্‌সে মাছ জোগাড় করেছেন আর গল্‌দা চিংড়ী যোগাড় করতে পারেন নি। চিন্তা করা মাত্র গল্‌দা চিংড়ীর মালাই-কারি এল। ডাক্তার বাবু কিন্তু এ কথা ভেবে দেখলেন না যে, তিনি মনে মনে চিন্তা করা মাত্র কি করে এক একটা জিনিস এসে উপস্থিত হচ্ছে। ভাবলেন, বোধ হয় দিতে ভুলে গিয়েছিল, এখন এনে দিচ্ছে। ফলের থালাটা কোলের কাছে টেনে এনে দেখলেন, ফলের আর বাকী কিছু নেই, এক আম ছাড়া।

তা এবারে এদিকে আম মোটেই হয় নি। গোড়ায় মুকুল ভালোই হয়েছিল। কিন্তু ফাল্গুনের গোড়ায় ক'দিন

কী যে কাল-বৃষ্টি হল, একটি মুকুল রইল না,—সব ঝরে গেল। আম নেই সেই জন্যেই। কিন্তু সেই মুহূর্ত্তে মালদহের ভালো ফজলী আম যখন তাঁর সামনে এল তখন আর তাঁর বিস্ময়ের সীমা রইল না। অবাক হয়ে ঠাকুরের মুখের দিকে চাইতেই,—সেই চোখ!—মরা ছাগলের মতো ঘোলাটে! ঠাকুর সঙ্গে সঙ্গে, যেন অপ্রস্তুত হয়ে, হেসে চোখ নামিয়ে চলে গেল বটে, কিন্তু সেই এক মুহূর্ত্তের দৃষ্টিই তাঁর হাড়ের ভেতর পর্য্যন্ত ঠক্ ঠক্ ক'রে কাঁপিয়ে দিলে।

ডাক্তার বাবু পরম পরিতোষ সহকারে আহার করেও কেমন যেন তৃপ্তি পেলেন না। তাঁর মন তখন বিভ্রান্ত হয়ে উঠেছে। কি যে করবেন ঠিক ক'রে উঠতে পারছেন না। কস্তুরী-সুবাসিত পান মুখে দিয়ে সুগন্ধি তামাক টানতে টানতে একবার মনে হ'ল পালিয়ে যান। এই থমথমে বাড়ী, বিশেষ ওই বুড়ো ভদ্র লোকটিকে তিনি কিছুতেই সহ্য করতে পারছিলেন না। ভদ্রলোক এখনও ঠিক সেই জায়গায় ঠিক তেমনি করে বসে। মুখে গড়গড়ার নল। মাঝে মাঝে ডাক্তারবাবুর মনে হচ্ছিল, ভদ্র লোকের মাথাটা আসল মাথা নয়,—শ্বেত পাথরের কিংবা অমনি কোনো কিছুর। কেবল থেকে থেকে ধূমপান করে প্রমাণ করছিলেন, না, মাথাটা নকল নয় আসলই। কিন্তু ভদ্রলোক চোখ তুলে তাকান না কেন? কথাই বা বলেন না কেন? এ রকম ভদ্রতা?

এমন সময় ভিতর থেকে ডাক্তারবাবুর ডাক এল রোগী দেখবার জন্যে। রোগীর নামে ভদ্রলোক চাঙ্গা হ'য়ে উঠলেন।

তাই বটে, বাড়ীতে কঠিন রোগী না থাকলে লোকে এমন বিমর্ষ হয়ে চুপচাপ থাকে না। ডাক্তারবাবু উৎসাহের সঙ্গে ভিতরে গেলেন। কত ঘর, কত বারান্দা যে পার হলেন তার আর ইয়ত্তা নেই। এত বড় বাড়ী রাজারুজী ছাড়া কারও হয় না। কিন্তু কোথাকার রাজা এঁরা? তিনি কি এঁদের নামও শোনেন নি? কি জানি, এ কোন দেশ!

অবশেষে রোগীর ঘরে গিয়ে উপস্থিত হলেন। প্রকাণ্ড বড় হল ঘরের এক প্রান্তে একখানা মেহগিনী খাটের উপর রোগী আপাদমস্তক একখানা চাদর ঢাকা দিয়ে শুয়ে। তার মাথার এক রাশ চুল খাট থেকে মেঝেয় লুটিয়ে পড়েছে। মাথার শিয়রে একটি মোমবাতি মিট মিট ক'রে জ্বলছিল। সে আলোয় এত বড় হল ঘরের কিছুই আলো হচ্ছিল না, কেমন অদ্ভুত ধরণের ঝাপসা দেখাচ্ছিল। খোলা জানালা দিয়ে ঘরের স্থানে স্থানে চাঁদের আলো এসে পড়েছিল। ডাক্তার বাবু অবাক হয়ে দেখলেন, সেই বুড়ো ভদ্রলোক ইতিমধ্যেই কি করে তাঁর আগে এসে ঘরের মাঝখানে বসে আছেন। এ ঘরেও মেঝেতে জাজিম পাতা। আর ভদ্রলোক নীচের ঘরের মতো অবিকল তেমনি করে বসে,—চোখ নামানো, মুখে সেই গড়গড়ার নল, নিঃশব্দে বসে।

কিন্তু অত্যন্ত নিরীহ ডাক্তারও রোগীর সামনে চটপটে হয়ে পড়েন।

ডাক্তারবাবু একবার ঘরের চারদিকে তাকিয়ে যেন কোনো কিছুতে ভ্রূক্ষেপ না করেই রোগীর পাশের খালি চেয়ারটায়

চাদরের ভিতর থেকে ডাক্তারবাবুর দিকে একখানা মাংসহীন হাত এসে ঠেকলো (পৃঃ ৪৯)

বসলেন। কারো দিকে না চেয়েই যেন দেওয়ালকে লক্ষ্য করে বললেন, কদ্দিন থেকে অসুখ হয়েছে? অসুখটা কী?

কেউ জবাব দিলে না।

ডাক্তারবাবু আবার জিগ্যেস করলেন, কই দেখি মা, আপনার হাতটা?

এতক্ষণে যেন রোগীর দেহে স্পন্দন দেখা গেল। কিন্তু মুখের ঢাকা খুললে না, বোধ হয় স্ত্রীলোক বলে।

ডাক্তার আরও এগিয়ে এসে আর একবার বললেন, দেখি হাতখানা।

বলে হাত বাড়াতেই আর একখানা হাত চাদরের ভিতর থেকে বেরিয়ে ধীরে ধীরে তাঁর হাতে এসে ঠেকল,—মাংসহীন হাত, আস্ত একখানা হাড়। ডাক্তারবাবুর সমস্ত দেহে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল। ভয়ে তিনি চোখ বন্ধ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে বাতি গেল নিবে। হা হা করে চারিদিক থেকে একটা বিকট আওয়াজ উঠল। মনে হ'ল সে শব্দে সমস্ত বাড়ীটা বোধ হয় হুড়মুড় ক'রে তাঁর মাথায় ভেঙ্গে পড়বে। আর চোখ বন্ধ ক'রেও দেখতে পেলেন, হাজার জোড়া ঘোলাটে চোখ চারিদিকে হাওয়ায় নেচে নেচে বেড়াচ্ছে, আর মিটি মিটি হেসে ইসারা ক'রে তাঁকে যেন ডাকছে।

ডাক্তারবাবু অজ্ঞান হ'য়ে চেয়ার থেকে সশব্দে মেঝেয় পড়ে গেলেন।

যখন তাঁর জ্ঞান হল তখনও ভাল করে ভোর হয়নি। দেখলেন, বাড়ীটা বড় বটে, কিন্তু রাত্রে যে ঐশ্বর্য্য দেখেছেন তার

কিছুই নেই। দেওয়ালের চুণ বালি খসে খসে পড়েছে। ঘুলঘুলিতে হাজার হাজার চামচিকে বাসা বেঁধেছে। আর ঘরের মধ্যে ভীষণ একটা দুর্গন্ধ উঠেছে! মেঝেতে কাল যে জাজিম দেখেছেন তার চিহ্নমাত্র নেই, সে লোকজনও কোথায় অদৃশ্য হয়েছে। ঘরের এক প্রান্তে একটা খাট আছে বটে,—কিন্তু মেহগিনীর নয় একটা সাধারণ পায়া ভাঙা তক্তাপোষ! তার ওপরে যে ছেঁড়া তোষকটা আছে তার থেকে ইন্দুরে তুলো বের করে ঘরময় ছড়িয়েছে। ডাক্তারবাবু প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে বাইরে এসে বসলেন। চেয়ার থেকে পড়ে যাওয়ার ফলেই হোক অথবা বহুদিন পরে ঘোড়ায় চড়ার জন্যেই হোক, সর্ব্বাঙ্গে ব্যথা বোধ হচ্ছিল। চারিদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগলেন যদি কারও দেখা পাওয়া যায়। এমন সময় দেখা গেল, একটি আধবুড়ো লোক আপন মনে হন হন করে আসতে আসতে হঠাৎ তাঁকে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে গেল। এইবার ছুট দেবে বোধ হয়।

ডাক্তারবাবু তাড়াতাড়ি ডাকলেন, শুনুন মশাই, শুনছেন? এটা কোন জায়গা বলতে পারেন?

মানুষের গলা শুনে লোকটি যেন আশ্বস্ত হ'ল। তবু দূর থেকেই বললে, মহেশপুর,—মালদ' জেলা।

—বলেন কি! সে যে অনেক দূর।

—তা বোম্বাই থেকে অনেক দূর বই কি! এখান থেকে কাছেই।

লোকটি এতক্ষণে কাছে সরে এল। হেসে বললে, 'কোথেকে আসছেন? ডাক্তার বুঝি?'

—হ্যাঁ, ডাক্তার। আসছি মুর্শিদাবাদ থেকে। জঙ্গীপুরের কাছে আমার বাড়ী।

—বুঝেছি।

—কি বুঝলেন বলুন তো ? এইখানে বসুন।

লোকটি তাঁর কাছে ব'সে বললে, "এই যে বাড়ী দেখছেন, এঁরা এককালে রাজা ছিলেন। ইদানীং অবস্থা খারাপ হয়ে আসছিল। কিছুদিন আগে গ্রামে হঠাৎ কলেরা লাগে। কলেরা জোর লাগতেই এখানকার হাসপাতালের ডাক্তার একদিন রাত্রে প্রাণের ভয়ে স্ত্রীপুত্র নিয়ে সরে পড়েন। ঠিক সেই রাত্রেই রাজবাড়ীতে কর্ত্তাবাবুর একমাত্র মেয়ের কলেরা হল। গ্রামের ডাক্তার নেই। চারিদিকে ঘোড়া নিয়ে লোক ছুটলো যেখান থেকে হোক ডাক্তার আনতে। কিন্তু ডাক্তার আর পাওয়া গেল না। কর্ত্তাবাবুর বড় পেয়ারের ঘোড়া, মশাই—অমন ঘোড়া আমার চোখে আজ পর্য্যন্ত পড়েনি,—মাঝে থেকে সেটারও যে কি হ'ল রাস্তাতেই মারা গেল। আর ভোর হ'তে না হতে রাজবাড়ীর সমস্ত লোকও শেষ হ'য়ে গেল। সে এক আশ্চর্য্য ব্যাপার মশাই, যেন ভোজবাজি।

কর্ত্তাবাবুর কথা উঠতেই ডাক্তার শিউরে উঠলেন। বললেন, তারপর ?

—তারপর আর কি মশাই ! মাঠে কোনো ডাক্তারকে রাত্রে একা পেলে তাঁর আর রক্ষা নেই। আপনি একা নন, এর আগে আরও দু'তিন জন ডাক্তার এমনি বিপদে পড়েছিলেন।

উঠতে উঠতে লোকটি বললেন, "যাকগে সে সব কথা মশাই।

একশো মাইলের ফেরে পড়েছেন। এবেলা আমার ওখানেই খাওয়া দাওয়া করবেন চলুন, ওবেলা আপনার যাওয়ার যা হয় ব্যবস্থা করা যাচ্ছে।"

ডাক্তারবাবু উঠতে উঠতে বললেন, "তাই চলুন।"

এক যে ছিল গ্রাম। নিতান্তই চাষার গ্রাম। কেবল এক ঘর মাত্র বামুন। তা সে বামুনের অবস্থাও তথৈবচ। কোনো রকমে প্রথম ভাগ শেষ ক'রে শত জায়গায় তিলক-ফোঁটা কেটে শতফুটি হয়ে ব'সেছে। গ্রামের চাষাদের ধারণা এত বড় পণ্ডিত ও-তল্লাটে আর নেই। তাদের ক্ষেতে যা কিছু হয়, আগে দাদাঠাকুরকে না দিয়ে কেউ ঘরে তোলে না। এমনি ক'রে দাদাঠাকুরের দিন কোনো কাজকর্ম্ম না ক'রেও বেশ সুখে-স্বচ্ছন্দেই চলে যায়।

অনেক দিন পরে গ্রামের চাষীরা একদিন সকালে চণ্ডীমণ্ডপের দাওয়ায় ব'সে গল্প করছিল। এমন সময় দেখলে, বহু লোক ভারে ভারে নানা জিনিষ নিয়ে যাচ্ছে,—ঘড়া, ঘটি, তৈজসপত্র এবং আরও কত কি।

চাষীরা জিজ্ঞাসা করলে, কে যায়?

দলের মধ্যে থেকে একজন উত্তর দিলেন, মধ্যম গ্রামের সার্ব্বভৌম মহাশয়।

চাষীরা শশবস্তে দাওয়া থেকে নেমে এসে সার্ব্বভৌম মশায়কে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলে।

জিজ্ঞাসা করলে, কোথায় গিয়েছিলেন দা' ঠাকুর ?

সার্ব্বভৌম তাদের আশীর্ব্বাদ ক'রে হেসে বললেন, রাজবাড়ীতে এক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত এসেছিলেন, তাঁর সঙ্গে শাস্ত্রালোচনা করতে গিয়েছিলাম বাবা।

—তা এই সব জিনিষপত্র ?

সার্ব্বভৌম সবিনয়ে বললেন, তাঁকে তর্কে পরাস্ত ক'রে এই সব পেলাম।

—তাই নাকি ? তাহ'লে তো আজ এখানে পায়ের ধূলো দিয়ে যেতে হবে ?

সার্ব্বভৌম মশায় বিস্মিতভাবে বললেন, কেন বাবা, এখানে কি ব্যাপার ?

—আজ্ঞে, আমাদের এখানেও এক ভীষণ পণ্ডিত আছেন। তাঁর সঙ্গে তর্ক ক'রে যেতে হবে।

এখানে যে একজন বড় পণ্ডিত আছেন, সে খবর সার্ব্বভৌম মশায় এর আগে কখনও শোনেনি। বললেন, তা তো জানতাম না বাবা। কি তাঁর নাম ?

—শতফুটি দা' ঠাকুর।

এ নাম তিনি জীবনে শোনেননি। ভাবলেন, তা হবে। হয় তো সম্প্রতি কোনো বড় পণ্ডিত এখানে এসে বাস করছেন। তিনি আর আপত্তি করলেন না।

বললেন, বেশ, তাই হবে।

চাষীরা বললে, শুধু হবে নয় ঠাকুর মশাই। আপনি যদি জেতেন তাহ'লে আমাদের দা' ঠাকুরের যা আছে সব পাবেন।

আর যদি হারেন, তাহ'লে যা নিয়ে যাচ্ছেন সব রেখে এখানে যেতে হবে।

সার্ব্বভৌম মশায় তাতেও আপত্তি করলেন না। তাঁর আর ভয় কি? অত বড় দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকে যিনি হারিয়ে এসেছেন, এ অঞ্চলে তাঁকে হারাবে কে?

ভারীরা সেইখানে জিনিসপত্র সব নামালে। সে সব দেখে চাষাদের তাক লেগে গেল! কত সোনা রূপার বাসন, কত পাটের কাপড়, কত টাকা-মোহর। জীবনে তারা এ সব দেখেনি। পরম সমাদরে তারা সার্ব্বভৌম মশায়ের জন্যে চণ্ডীমণ্ডপে থাকবার জায়গা ক'রে শতফুটি দাদাঠাকুরকে গেল খবর দিতে।

দাদাঠাকুর সমস্ত শুনে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে একটা হাই তুলে একবার হাসলে।

জিজ্ঞেস করলে, আমার মতো লম্বা-চওড়া?

চাষীরা বললে, কোথায় পাবেন? আপনার আধখানা। যেমন বেঁটে, তেমনি রোগা। আর কথা কয়, যেন ছ'মাস খায়নি। দেখে আমাদের ভক্তি হ'ল না মশায়। শ্রীচৈতন্যটিও আপনার আধখানা।

দাদাঠাকুর আশ্বস্ত হয়ে আর একবার হাসলেন। বললেন, বেশ। পাঁচ খানা গাঁয়ে ঢোল দে। আমি পূজো-আহ্নিক সেরে বিকেলে যাব।

বিকেল হ'তে না হ'তে চণ্ডীমণ্ডপের উঠানটা একেবারে ভর্ত্তি হয়ে গেল। তিল ধারণের আর জায়গা রইল না। এ সময়টা

চাষের কাজ নেই। কাজেই পাঁচখানা গ্রামের যত চাষী সবাই এসে জুটল।

সার্ব্বভৌম মশায় চণ্ডীমণ্ডপের দাওয়ায় একখানা আসনের উপর চোখ বন্ধ ক'রে যেন ধ্যানস্থ হয়ে ব'সে। তাঁর সামনের আসনখানা তখনও পর্য্যন্ত খালি রয়েছে, শতফুটি দাদাঠাকুর তখনো আসে নি।

একটু পরে হেলতে দুলতে সে এলো। মিশকালো, লম্বা-চওড়া চেহারা। তার উপর শত স্থানের তিলক চিহ্ন যেন জ্বল্ জ্বল্ করছে। উঠানের জনতা সসম্ভ্রমে তাকে পথ ছেড়ে দিলে।

প্রথামত সার্ব্বভৌম মশায় উঠে দাঁড়িয়ে তাকে নমস্কার জানালেন, ব্রাহ্মণেভ্যঃ নমঃ।

কিন্তু দাদাঠাকুর নমস্কারও ফিরিয়ে দিলে না, একটা কথাও কইলে না। আসনে না ব'সেই বজ্র কণ্ঠে বললে।

—বলুন তো, ফুন ফুনাফুন?

ফুন ফুনাফুন? সার্ব্বভৌম মশায় যেন বিশ বাঁও জলে পড়লেন। আকাশ-পাতাল হাতড়াতে লাগলেন, কিন্তু 'ফুন ফুনাফুন' ব'লে কোনো শব্দ কোথাও প'ড়েছেন বলে মনে পড়ল না। এ জীবনে যত পুঁথি তিনি পড়েছেন সব তন্ন তন্ন ক'রে ভাববার চেষ্টা করলেন। বেদ-বেদান্ত-পুরাণ-সংহিতা, না, ও শব্দটি একেবারে নতুন।

শতফুটি দাদাঠাকুর আবার ধমক দিলে, বলুন।

সার্ব্বভৌম মশায় ঘামতে লাগলেন। তাঁর মাথা ঘুরতে

(সার্বভৌম মহাশয় ভ্রূকুটি দাদাঠাকুরের প্রশ্ন শুনিয়া আকাশ-পাতাল
ভাবিতে লাগিলেন পৃঃ ৫৬)

লাগল। চক্ষে অন্ধকার দেখলেন। লজ্জায়, ধিক্কারে তাঁর চোখ ফেটে জল আসবার মতো হ'ল। অত বড় দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকে হারিয়ে এসে শেষে এইখানে হারতে হ'ল। সমুদ্র পার হয়ে এসে গোষ্পদে ভরাডুবি? কি আশ্চর্য্য! এত শাস্ত্র পড়েছেন, বলতে গেলে শাস্ত্রের আর বাকি রাখেন নি, কিন্তু এমন অদ্ভুত শব্দ তো কোথাও পাননি! 'ফুন ফুনাফুন'?

কিন্তু শতফুটি আর ভাবতে সময় দিলে না।

উঠে দাঁড়িয়ে বললে, কিছুই না প'ড়ে আমার সঙ্গে এসেছ তর্ক করতে? চালাকির আর জায়গা পাওনি? এই, কে আছিস!

চাষারা হৈ হৈ ক'রে উঠে দাঁড়াল। দা'ঠাকুর জিতেছে, তাদের আর পায় কে?

শতফুটি হুকুম দিলে, এর যা কিছু আছে, সব নিয়ে গিয়ে আমার বাড়ী তোল। আর একে গাঁ থেকে টিন বাজিয়ে বার ক'রে দে।

তাই হ'ল।

* * * *

ঠাকুর কাঁদতে কাঁদতে বাড়ী চললেন। কান্নার আর দোষ কি? তাঁর ধন গেল, সম্পদ গেল, এমন কি সম্মান পর্য্যন্ত গেল। এরপরে গ্রামে গিয়ে মুখ দেখাবেন কি ক'রে? সার্ব্বভৌম মশায় কাঁদতে কাঁদতে চললেন। তাঁদের গ্রামের

ধারে তাঁর ছোট ভাই তখন একটা গাছের উপর থেকে পাতা ভেঙ্গে ভেঙ্গে নীচে ফেলে দিচ্ছিল, আর গরুগুলো নীচে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাই খাচ্ছিল।

সার্ব্বভৌমের এই ভাইটি লেখা পড়ার ধারে দিয়ে যায় নি। বাড়ীতে চাষ-বাস, ক্ষেত-খামার দেখে। কিন্তু দাদার উপর তার অচলা ভক্তি। গাছের উপর থেকে দাদাকে কাঁদতে কাঁদতে আসতে দেখে সে তাড়াতাড়ি নেমে এল। ছুটে গিয়ে দাদার পায়ের ধূলো দিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, দাদা, তুমি কাঁদছ কেন? কি হয়েছে তোমার?

সার্ব্বভৌম সেইখানে বসে পড়ে কাঁদতে কাঁদতে বললেন ভাইরে, এবার আমি দেশ ছেড়ে চললাম। এ মুখ আর দেশে দেখাব না।

—কেন? কি হ'ল? দিগ্বিজয়ীর কাছে হেরে এলে? তা অমন হার জিত কত হয়!

—না রে ভাই. হেরেছি বটে, কিন্তু দিগ্বিজয়ীর কাছে নয়। তাঁকে হারিয়ে ভারে ভারে জিনিস পত্র নিয়ে আসছি, পথে এক শতফুটির পাল্লায় প'ড়ে...

সার্ব্বভৌম সব কথা ভাইকে খুলে বললেন।

ভাই তো হেসেই অস্থির; বললে, কি জিজ্ঞেস করলে? ফুন ফুনাফুন?

—হ্যাঁ।

ভায়ের হাসি আর থামে না। বললে, ও সব তোমার শাস্তরে নেই দাদা। আমার শাস্তরের কথা, তুমি জানবে কি ক'রে? দাও তোমার চাদরখানা।

সার্ব্বভৌম তাড়াতাড়ি ভায়ের হাত চেপে ধরলেন। বললেন, পাগল! আমি তার সঙ্গে পারলাম না, আর তুই গণ্ডমূর্খ, তুই যাবি!

কিন্তু ভাই কিছুতেই শুনলে না। বললে, দাও না চাদর খানা। বাড়ী গিয়ে কাউকে পাঠিয়ে দেবে। সে এসে গরুগুলো নিয়ে যাবে। দেখই না আমি কি ক'রে আসি! আমার দেরী বেশী হবে না।

*   *   *   *

সার্ব্বভৌম ভাইকে আটকে রাখতে পারলেন না। তাঁর কাছ থেকে চাদরখানা এক রকম কেড়ে নিয়েই সে চ'লে গেল। দাদার অপমানে সে বেজায় চ'টে গেছে। পথে কোথাও থামল না, থামল একেবারে ময়না নদীর ধারে গিয়ে। এই নদীটির ধারেই শতফুটির গ্রাম।

নদীর জলে নেমে বেশ ক'রে সে হাত পা ধুয়ে ফেললে। তারপরে সারা দেহে নানা জায়গায় তিলক কেটে গ্রামের মধ্যে ঢুকল। তখন চণ্ডীমণ্ডপে সার্ব্বভৌম মশায়ের লাঞ্ছনা নিয়ে চাষাদের মধ্যে খুব হাসা হাসি চলছিল। তিলক কাটা ব্রাহ্মণকে দেখে তারা বললে, কে যায়?

সে বুক ফুলিয়ে চোখ পাকিয়ে উত্তর দিলে, আমি সহস্রফুটি দাদাঠাকুর।

ওরে বাবা! ওদের দাদাঠাকুর শতফুটি, এ আবার সহস্র-

ফুটি! সবাই একটু দমে গেল। পরস্পরের মুখ চাওয়া চাওয়ি ক'রে বললে, কি চান?

সহস্রফুটি জোর গলায় বললে, তোমাদের এখানে শুনেছি একজন বড় পণ্ডিত আছে। আমি একবার তার সঙ্গে তর্ক করতে চাই।

শুনেই চাষারা হো হো করে হেসে উঠল। বললে, সে বড় সহজ পণ্ডিত নয় ঠাকুর। তুমি পালাও। এখনই এক দিগ্‌গজ পণ্ডিত তার কাছে হেরে সর্ব্বস্বান্ত হয়ে কাঁদতে কাঁদতে বাড়ী গেল।

সহস্রফুটি সগর্ব্বে বললে, ডাক তোমাদের দাদাঠাকুরকে। তাকে না হারিয়ে আমি ফিরচি না।

অগত্যা চাষারা গিয়ে তাকে ডেকে নিয়ে এল। শতফুটি হেলতে দুলতে এল। এসেই জিজ্ঞাসা করলে, বল দেখি ফুন ফুনা ফুন?

সহস্রফুটি প্রশ্ন শোনা মাত্র হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে শতফুটির গালে চটাং ক'রে বিরাশীসিক্কা ওজনের প্রকাণ্ড এক চড় বসিয়ে দিলে।

রাগে কাঁপতে কাঁপতে বললে, বেল্লিক! ফুন ফুনা ফুন? আগে টুক টুকা টুক, তার পর গুন গুনা গুন, তার পর ফুন ফুনা ফুন।

প্রচণ্ড চড় খেয়ে শতফুটি তখন চোখে অন্ধকার দেখতে দেখতে বসে পড়েছে। তার আর কথা বলবার শক্তি নেই। সহস্রফুটি তার হাত ধরে একটা ঝাঁকি দিতেই সে যন্ত্রণায় হাউ

হাউ করে কেঁদে ফেললে। কারণ সহস্রফুটির গায়ে ভীষণ জোর। শতফুটির চেয়ে অনেক বেশী। তার হাতে অমন জোরে চড় খেয়ে না কেঁদে উপায় কি ?

চাষারা সার্ব্বভৌমের বেলায়ও কিছু বোঝেনি। এখনও তর্কের কিছু বুঝল না। কিন্তু তাদের দাদাঠাকুরকে মাথায় হাত দিয়ে ব'সে প'ড়ে অঝোরে কাঁদতে দেখে তাদের বুঝতে বাকী রইলো না যে, এবারে শতফুটির হার হয়েছে।

সহস্রফুটি ঘুরে ফিরে সকলকে বুঝিয়ে দিতে লাগল।

—এ সব তুলো-ধোনা শাস্তরের কথা। আগে তুলো গুলো টুক টুক করে বেছে নিতে হয়। তারপর জোরে জোরে গুণ গুণ করে ধুনতে হয়। ধোনা হয়ে গেলে ফুন ফুন করে হালকা ঘা দিতে হয়। বেল্লিকটা সেই কথা আমাকে বোঝাতে এসেছে ! ওরে বাবা ! ঘেরণ্ড সংহিতা থেকে তুলো-ধোনা পর্য্যন্ত আমার কি আর শাস্ত্রর পড়তে বাকি আছে ?

শুনে চাষারা জয় ধ্বনি ক'রে উঠল, জয় সহস্রফুটি দাদা-ঠাকুরের জয় ! সবাই তার পায়ের তলায় গড়াগড়ি দিতে লাগল। আর শতফুটিকে ঢাক বাজিয়ে গ্রাম থেকে বার ক'রে দিলে। সার্ব্বভৌমের কাছ থেকে যত জিনিষ সে পেয়েছিল, সব তারা সহস্রফুটিকে দিয়ে দিলে।

সহস্রফুটি কয়েক দিন সেখানে থেকে তারপর খুব ধূম ধাম ক'রে সমস্ত জিনিষ পত্র নিয়ে বাড়ী গেল।

দাদাকে গিয়ে সব কথা বলতেই তিনি আনন্দে আত্মহারা হয়ে ভাইকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। বললেন, আমারই ভুল

হয়েছিল ভাই! পণ্ডিতের সঙ্গেই পণ্ডিতের তর্ক হয়। মূর্খের সঙ্গে তর্কে পণ্ডিত পারবে কেন! ওর সঙ্গে তর্ক করতে যাওয়াই আমার অন্যায় হয়েছিল। তা বেশ হয়েছে! ওরা যখন ধরেছে, তখন তুই ওদের গাঁয়েই দাদাঠাকুর হয়ে বসবাস কর বরং। কিন্তু দেখিস, যেন আমার মত নিরীহ কোন পণ্ডিত পেয়ে তাকে ঠকাসনে।

তার পর সহস্রফুটি দাদাকে প্রণাম করে মনের আনন্দে ওদের গ্রামে বাস করতে চলে গেল।

ভূত আছে কি নেই সে সম্বন্ধে এখনও আমি সুনিশ্চিত হ'তে পারিনি। হয়ত আছে, হয়ত নেই। অথচ যে গল্প আজ তোমাদের শোনাতে যাচ্ছি সে আমার নিজের জীবনে ঘটেছে; আমার নিজের চোখেই দেখা—কিন্তু তাতে কি? সে অভিজ্ঞতার পরেও আমি জোর ক'রে আজও বলতে পারি না যে ভূত আছে, সত্য সত্যই ভূত আছে।

কিন্তু ভূত থাক আর নাই থাক, ভূতের ভয় যে আছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। শুধু তোমাদের মত ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের মনেই যে আছে তা নয়, বয়স্ক লোকের মনেও আছে। সত্যি কথা বলিতে কি, আমি অনেক দুঃসাহসিক লোককে জানি, যারা ভূতে বিশ্বাস করেনা কিন্তু ভূতের ভয়ের হাত থেকে রেহাই পায় না। অন্ধকার পথে, নির্জ্জন মাঠে একলা পথ চল্‌তে তাদেরও গা ছমছম করে। অথচ আজ পর্য্যন্ত কাউকে কখনও

নিজের চোখে ভূত দেখতে শুনেছো? কিংবা শুনেছো ভূতে সত্যিসত্যি কারও ঘাড় মটকে দিয়েছে? আসল কথা ভূতে বিশ্বাস কর চাই না কর, ভূতের ভয়টা একেবারেই বাজে। ভূত যদি না থাকে তাহ'লে তো কথাই নেই, আর যদি থাকেও তারা মানুষের কোন অনিষ্ট করেনা, হয়ত করতে পারেও না। আমি আমার নিজের জীবনে ঘটা যে গল্পটা বলতে যাচ্ছি তা থেকেই বুঝতে পারবে একথাটা সত্যি কি না। গল্পটা তোমাদের ভালো লাগতেও পারে।

কিন্তু তার আগে গল্পটাই শোন:

আমার বাবা ছিলেন ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ছেলেবেলেটা যে কত জায়গায় ঘুরেছি তার আর সীমা সংখ্যা নেই। বিহার-উড়িষ্যা তখন বাংলার মধ্যেই ছিল। অনেক জায়গা ঘুরতে ঘুরতে বাবা অবশেষে বিহারের একটি ছোট সহরে বদ্‌লি হ'লেন। সে সহরের নামটা আর তোমরা নাই শুনলে। বেশ মনে আছে সহরের বাইরে সুন্দর একটি বাঙ্গলোতে আমাদের বাসা হ'ল। বাঙ্গলোটি চারিদিকে ক্রোটনের বেড়া দিয়ে ঘেরা। বেড়াটি মালির হাতে সযত্নে ছাঁটা। সামনের প্রশস্ত জায়গাতে চমৎকার একটি বাগান—কত রকমের ফুলের ও শাকসব্জির।

আগেই বলেছি জায়গাটা সহরের বাইরে। এপাশে ওপাশে আমাদেরই মত আরও কয়েকটি সরকারী কর্ম্মচারীর বাসা। এছাড়া কাছে আর কোনো লোকালয় নেই। জানালা খুললেই

চোখে পড়ে ছোট ছোট গাছে ঢাকা কয়েকটি পাহাড় নিজের ছায়ায় স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে। সেখান থেকে আরম্ভ করে যতদূর দৃষ্টি চলে মহুয়া, শাল, আমলকি এবং আরও বহুতর গাছের ঘন জঙ্গল।

বেশ মনে পড়ে মাসটা জুন কিংবা জুলাই। ঘটা করে কখনও আসে মেঘ, পাহাড়ের গায়ে অরণ্যের মাথায় তারই সুস্নিগ্ধ কোমল ছায়া নামে। আবার কখনও ওঠে চিড়চিড়ে রোদ্, রাঙা মাঠ ধূ ধূ করে।

তখন আমার বয়স বারো কি তেরো। সন্ধ্যের পরে আকাশটা বেশ পরিষ্কার হয়েছে। একফালি চাঁদও উঠেছে। বেশ চমৎকার রাত্রি—সে সময় স্কুলের ছুটি। সেই উপলক্ষে আমার দু'টি আত্মীয়ও এসেছে বেড়াতে। তারা দু'জনেই আমার সমবয়সী। মনের আনন্দে পাহাড়ে উঠে, জঙ্গলে ঘুরে এবং ছোট পাহাড়ে নদীটির ধারে ধারে বেড়িয়ে চমৎকার দিন কাটছিল। স্কুল বন্ধ, পড়ার তাড়া নেই। অবারিত অখণ্ড অবসর। তার উপর সমবয়সী সঙ্গী জুটেছে। সুতরাং আনন্দের আর বাকী কোথায়? রোজ নতুন নতুন জায়গায় বেড়াতে যাওয়াই ছিল আমাদের কাজ। কোনো দিন পাহাড়ে, কোনো দিন নদীর ধারে, কোনো দিন বা অন্য কোথাও।

সেদিন ফিরছিলাম নতুন একটা পাহাড়ের দিক থেকে। এই পাহাড়টির একটি বিশেষত্ব আছে। ঠিক পাহাড় বললে ভুল বলা হয়, আসলে এটা একটা প্রকাণ্ড পাথরের স্তূপ। শেওলা ছাড়া আর কিছুই তার উপর জন্মেনি। এর উপর থেকে নীচে

পর্য্যন্ত কে যেন তলোয়ার দিয়ে দু'ভাগে ভাগ ক'রে দিয়েছে। স্থানীয় লোকেরা বলে কাজটা ভীমের—মহাভারতের ভীমসেনের। যা কিছু অলৌকিক শক্তির কাজ তাই আমরা ভীমের নামের সঙ্গে জড়িয়েছি। এখানেও তাই হ'য়েছে। আসলে ব্যাপারটা নিজের থেকেই হ'য়েছে। কিন্তু এমন আশ্চর্য্যরকমে হ'য়েছে যে দেখলে মনে হয় সত্যিই কে বুঝি তলোয়ার দিয়ে দু'ভাগে চিরে দিয়েছে।

এই আলোচনা করতে করতে আমরা তিন বন্ধুতে আসছিলাম। হঠাৎ চোখে পড়লো একটা জরাজীর্ণ পুরাণো বাড়ী। তার জায়গায় জায়গায় চূণ বালি খসে পড়েছে, আর জায়গায় জায়গায় এখনও লেগে রয়েছে। দোতালার ছাদের আধখানা ভেঙ্গে পড়েছে। তার কড়িবর্গাগুলো দেখা যাচ্ছে। আর তারই ফাঁক দিয়ে কটি বটের চারা উঁকি দিচ্ছে। চাঁদের আলোয় বাড়ীটাকে যেন কেমন রহস্যজনক মনে হচ্ছে। বাড়ীটা যদিও আমাদের বাসা থেকে বেশী দূরে নয়, কিন্তু ওদিকটায় এর আগে আর কখনও আসিনি। এই আশ্চর্য্য বাড়ীটার দিকে অনেকক্ষণ আমরা চেয়ে রইলাম। বাসায় ফিরে চাকরটাকে জিগ্যেস করে জানলাম বাড়ীটা ভীষণ বাড়ী,—এদিকের যত ভূতের ওইটেই নাকি বোর্ডিং হাউস।

শুনে আমরা তিনজনেই খুব হাসলাম। আমি নিজে ভূত বিশ্বাস করি না। আমার বন্ধু বিজনও না। কেবল অর্দ্ধেন্দুর মন সন্দেহের দোলায় দুল্‌তে লাগলো। কিন্তু আমরা দু'জনে তা'কে আমল দিলাম না। স্থির করলাম কাল রাত্রে যদি বৃষ্টি

না হয় তাহ'লে এই ভূতের বোর্ডিং হাউসটা ভাল করে দেখতেই হবে। কি ক'রে তা সম্ভব সমস্ত রাত ধরে আমরা তারই পরামর্শ আঁটতে লাগলাম।

* * * *

আমাদের ভাগ্যক্রমেই হোক্, অথবা দুর্ভাগ্যক্রমেই হোক্, পরের দিন বৃষ্টি হ'ল না। আকাশ একেবারে মেঘমুক্ত না হ'লেও ফুটফুটে জ্যোৎস্নার অভাব হ'ল না। অনেক রাত্রে বাড়ার সবাই ঘুমিয়ে গেলে আমরা তিন বন্ধুতে চুপি চুপি যাত্রা করলাম। সঙ্গে নিলাম একটি টর্চ্চ (একটির বেশী আমাদের ছিলও না), একটি মোমবাতি, দেশলাই, একখানা বড় ছুরি আর ছোট ছোট কয়েকটি লাঠি।

বড় রাস্তা থেকে যে সরু রাস্তাটি ভূতের বোর্ডিং হাউস পর্য্যন্ত গেছে অব্যবহারে এবং অযত্নে তা আগাছায় ও জঙ্গলে ঢেকে গেছে। টর্চ্চের আলো ফেলে, লাঠির শব্দ ক'রে অত্যন্ত সন্তর্পণে যেতে হচ্ছিল। ভয়ও করছিল ভীষণ,—কিন্তু ভূতের নয়, সাপের। ভয়ের সঙ্গে সঙ্গে একটা উদ্দীপনাও ছিল। ছেলে মানুষ হ'লেও আমরা যে ভীষণ একটা কিছু করতে যাচ্ছি—একটা দুঃসাহসিক কিছু,—সেই গৌরব ও গর্ব্বে আমাদের বুক ফুলে উঠছিল। অর্দ্ধেন্দুর আসবার উৎসাহ খুব বেশী ছিল না। কিন্তু আমাদের দেখাদেখি সেও ক্রমশঃ উৎসাহিত হ'য়ে উঠল। না হয়ে উপায়ই বা ছিল কি!

এমনি করে বহু ক্লেশে আমরা কোন রকমে বাড়ীটার সদর দরজায় এসে পৌঁছুলাম। কিন্তু দরজা বন্ধ। যাই কোন দিক দিয়ে? অবশ্য উইপোকায় কেটে দরজার আর বিশেষ কিছু রাখেনি। খানিকটা ধ্বস্তাধ্বস্তি করলে সেটার ভূশয্যা গ্রহণ করতে বিলম্ব হবে না। তবু বাড়ীটার চারিদিকে ঘুরে ঘুরে কোনো দিকে আরও সহজ কোনো পথ আছে কি না ভালো ক'রে দেখতে লাগলাম।

কিন্তু কোনো পথই দেখতে পেলাম না। হতাশ হ'য়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছি, কি করা যায়! এমন সময় একটা চামচিকা ঘরের ভিতর থেকে আমাদের মাথার উপর দিয়ে উড়ে চ'লে গেল!

প্রথমটা আমরা সকলেই চমকে উঠলাম। তারপরে খেয়াল হ'ল সামনের কাঁচের জানালার কাঁচ ভাঙ্গা। তাই দিয়ে ওটা ঘর থেকে বেরিয়ে এল। সঙ্গে সঙ্গে মনে হ'ল, এই তো রাস্তা পাওয়া গেছে। দরজা না ভেঙ্গে ওদিক দিয়ে তো সহজেই ভিতরে যাওয়া যেতে পারে! আশ্চর্য্য এই যে এতক্ষণ পর্য্যন্ত ওটা আমরা খেয়ালই করিনি।

তাই করলাম। আগে একবার টর্চ্চটা জ্বেলে ঘরের ভিতরটা ভালো ক'রে দেখে নিলাম সাপ-টাপ আছে কিনা। অবশ্য পায়ে আমাদের সকলেরই হাঁটু পর্য্যন্ত লম্বা বুট ছিল। তবু সাবধান হওয়া ভালো। তারপরে জানালার ফাঁক দিয়ে হাত গলিয়ে ছিটকিনি খুলে ফেললাম। বিজনের সাহস অপরিসীম। সেই আগে ভিতরে ঢুকলো, তারপর আমি; তারপর অর্দ্ধেন্দু। খুব ভয়ে ভয়েই প্রবেশ করলাম।

অতি হতভাগা চেহারার ঘর। চূণকাম খ'সে খ'সে মেঝের উপর পড়ে জঞ্জালের সৃষ্টি করেছে। জানালা দরজার ফাঁক দিয়ে বৃষ্টি এসে সেগুলি গেছে ভিজে। এর উপর ভাঙ্গা কাঁচ আছে, কাঠের টুকরো আছে এবং আরও যে কত কি আছে তার ইয়ত্তা নেই।

* * * *

এইখানে বাড়ীর ইতিহাসটা বলা দরকার। অনেক দিন পূর্ব্বে কোন গ্রাম্য জমিদার সখ করে নিজের জন্যে জেলার সহরে এই বাড়ীখানি তৈরী করেছিলেন। তিনি মারা যাওয়ার পর তাঁর নাবালক ছেলেদের কাছে এ বাড়ীর কোন প্রয়োজনই রইল না। বাড়ী ভাড়া দেওয়া হ'ল। এর কিছু পরেই সহরে প্লেগ দেখা দিলে। এই বাড়ীর প্রত্যেকটি লোক তাতে মারা গেল। সেই থেকে গত পনেরো বৎসরের মধ্যে এ বাড়ীর আর ভাড়া হয়নি। গুজব, সমস্ত রাত এই বাড়ীর আনাচে-কানাচে কারা যেন অত্যন্ত অস্ফুট স্বরে কেঁদে কেঁদে বেড়ায়। সমস্ত রাত দুপ্‌দাপ্‌ ক'রে কারা যেন বাড়ীময় দাপাদাপি করে যেন ফুটবল খেলা করছে।

ঘরের চেহারা দেখে অর্দ্ধেন্দু বললে, কী ভীষণ বাড়ী! বিজন বললে, চল, ভিতরে যাওয়া যাক্। অন্য সব ঘরে কি আছে দেখিগে।

অর্দ্ধেন্দু তার হাত চেপে ধরে বাধা দিলে। বললে কি হ'বে দেখে! তুমি তো আর ভূত বিশ্বাস কর না। এ বাড়ীতে ভূত থাক, আর না থাক তোমার কি?

বিজন বললে, ভূত বিশ্বাস করি না বটে, কিন্তু অবিশ্বাসও করি না। তা ছাড়া মজাটাই দেখা যাক্ না।

শেষ পর্য্যন্ত এই মজা দেখার ইচ্ছাটাই আমাদের পেয়ে বসল। আমরা মোমবাতিটা জ্বেলে ঘরে ঘরে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। আমরা নিজেদের অজ্ঞাতসারেই এত চুপি চুপি কথা বলছিলাম, যেন জোরে কথা কইতে সাহস করছিলাম না, পাছে উপরে যারা ঘুমিয়ে আছে তাদের ঘুম ভেঙ্গে যায়, ঘরের নিস্তব্ধতা নষ্ট হয়।

নীচের ঘরগুলো ঘুরে অবশেষে আমরা উপরে উঠতে লাগলাম। সঙ্কীর্ণ সিঁড়ি, সেকেলে ধরণের। তার উপরও চূণ বালির স্তূপ বড় কম জমেনি। মাঝে মাঝে এমন হয়েছে যে, একটা ধাপের সঙ্গে আর একটা ধাপ চিনতে পারা যাচ্ছিল না। দেওয়াল থেকে আরম্ভ করে সমস্ত কিছুর রং এমন মলিন হ'য়ে গেছে যে টর্চ্চের আলোও ম্লান বোধ হচ্ছিল। সেই স্বল্পান্ধকারে হাতড়াতে হাতড়াতে আমরা কি ক'রে যে উপরে উঠতে লাগলাম সে আমরাই জানি।

প্রথমেই একটা বড় হল ঘর। বাঁ দিকের খোলা দরজা দিয়ে আরও দু'টি ঘর দেখা যাচ্ছে। দু'টি ঘরেরই দরজা জানালা সব খোলা। দক্ষিণের জানালা দিয়ে দু'টি ঘরেই প্রচুর চাঁদের আলো এসে পড়েছে। ডান দিকের দরদালানের ওদিকে যে কি আছে অন্ধকারে তা বোঝা যাচ্ছিল না। আর আমাদের পাশের সিঁড়িটা এঁকে বেঁকে ছাদে গেছে কি মাঝ পথেই শেষ হয়ে গেছে, তা ভগবানই জানেন।

প্রথমেই আমরা বাঁদিকের ঘরে গেলাম। এ ঘরে খোলা জানালা দিয়ে এত বেশী চাঁদের আলো পড়েছে যে, আলোর কোনো দরকার ছিল না। তবু অন্ধকার কোণগুলোর জন্যে বাতিটা জ্বেলেই রাখলাম।

প্রকাণ্ড বড় নিস্তব্ধ ঘর। জানালা দিয়ে বাইরের অন্ধকার বাগানটা নজরে পড়ছে। ঘরের মধ্যে একটা ভাঙ্গা খাট। তার উপর বিছানা পাতাই আছে। ইঁদুরে সেই বিছানা কেটে ঘরময় তূলো ছড়িয়ে খেলা করছে। এক কোণে একটা ভাঙ্গা বেহালা পড়ে রয়েছে। তার উপর প্রচুর ধূলো এবং ময়লা জমেছে। এ ছাড়া আর কিছু নজরে পড়ল না। ঘরখানা দিনের আলোয় দেখলে অত্যন্ত নীরস মনে হ'ত। রাত্রেও যে বিশেষ ভয়াবহ মনে হ'ল, তা নয়।

অর্দ্ধেন্দু বিরক্তভাবে বললে, এইতো বাপু? এর আর দেখবে কি?

বাস্তবিক আমিও যেন খানিকটা হতাশ হ'য়ে পড়লাম। আশা করেছিলাম লোমহর্ষণ কিছু দেখতে পাবো, অন্ততঃ শুনতে পাবো। ঘরে আসামাত্র গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠবে। ভূতের সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যাহোক্ একটা নতুন কিছু অভিজ্ঞতা লাভ করব? কিছুই না। শুধু একটা জরাজীর্ণ পুরানো বাড়ী এইমাত্র।

বিজন বললে, চল অন্য ঘরগুলো দেখা যাক্।

সে বোধ হয় তখনও হতাশ হয়নি।

অন্ধকার দরদালানের দিকে তাকিয়ে আমি চুপকরে দাঁড়িয়ে রইলাম।

এমন সময়, অকস্মাৎ...

ব্যাপারটা গুরুতর কিছুই নয়। কিন্তু আমার যেন কেমন মনে হ'ল। মনে হ'ল, আমার মস্তিষ্ক যেন ঠিকভাবে কাজ করছে না। আমি যেন ঠিক গুছিয়ে সব ভাবতে পারছি না। চিন্তার বেগ যেন ঠিক দ্রুত হচ্ছে না। মাঝে মাঝে কেমন যেন জট্‌ পাকিয়ে যাচ্ছে। যেন একটা অত্যন্ত সূক্ষ্ম কালো পর্দ্দা আমার মস্তিষ্কের বাঁদিক থেকে ডান দিক দিয়ে গড়াতে গড়াতে এগিয়ে আসছে। আবার ফের ডান দিক থেকে বাঁদিকে এগিয়ে আসছে। যেদিকটা যখন ঢাকা পড়ছে সেদিকে তখন কিছুই ভাবতে পারছি না। আবার যখন সমস্তটা গুটিয়ে যাচ্ছে তখন বেশ চিন্তা করতে পারছি। কিন্তু তখনই আবার কালো পর্দ্দাটা গড়াতে গড়াতে মস্তিষ্ক আচ্ছন্ন ক'রে ফেলছে।

আমার মাথার মধ্যে এমনি আলোছায়ার খেলা ক্রমশঃ দ্রুত চলতে লাগলো। বেশ বুঝতে পারছি এ কোনো ওষুধের ক্রিয়া নয়। দরদালানের ওদিকের ঘর থেকে কি যেন একটা অদৃশ্যশক্তি আমার মাথার মধ্যে এই খেলা খেলছে, তার ঠিক বর্ণনা দিতে পারা যায় না।

আমার চোখমুখের অবস্থা দেখে সব্বাই ওরা বললে, তোমার আবার কি হ'ল?

আমার তখন গলা দিয়ে স্বর বার হচ্ছে না। হাঁপাতে হাঁপাতে কোন রকমে বললাম. বাতিটা। শিগগির বাতিটা। পালাই চল।

কে যেন আমার হাতে বাতিটা দিলে। কে যেন ঠেলতে ঠেলতে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নিয়ে এল। কি করে জানালাটা খুঁজে

পেলাম জানি না। তার পরে, কালো সূক্ষ্ম পর্দ্দাটা আমার মস্তিষ্ক আচ্ছন্ন করে ফেললে।

* * * *

এক মিনিট পরে জ্ঞান হ'লে দেখি, সামনের বাগানে ঘাসের উপর শুয়ে আছি। দেহে আর কোনো গ্লানি নেই, কেবল একটু ক্লান্ত।

—কি হয়েছিল তোমার ?

—কি জানি ! বিশেষ কিছুই নয় বোধ হয়।

একটু পরে বললাম, সে যাই হোক্, দোহাই তোমাদের, আর ভিতরে যেওনা।

কিন্তু বিজনের তখন ভিতরে যাওয়ার জেদ আরও বেড়ে গেছে। আমার কি হ'য়েছিল এবং কেন অমন হয়েছিল তা তাকে জানতেই হবে। সমস্ত ঘরগুলো তন্ন তন্ন ক'রে খুজে দেখতে হবে কোথায় কি আছে। আমাকে সুস্থ দেখে ওরা আবার ভিতরে গেল। প্রত্যেকটি ঘর, ঘরের প্রত্যেকটি কোণ তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজে দেখলে। কোথাও কিছু নেই। ঘরেও না, সিঁড়িতেও না।

বাড়ীটা নিতান্ত সাধারণ একটা বাড়ী। তার মধ্যে জটিলতা কিছু ছিল না। ঘরগুলো বড় বড় এবং সমচতুষ্কোণ। কোনো ঘরে আসবাবপত্রের এমন কিছু বাহুল্য নেই যার মধ্যে ভূত লুকিয়ে থাকতে পারে। টেবিল, চেয়ার, আলমারী, দেরাজ, এমন কি একটা সিন্দুক পর্য্যন্ত না।

প্রায় আধ ঘণ্টা পরে তারা ফিরে এসে জানালে, সব জায়গা তারা ঘুরে এল, মায় সেই অন্ধকার ঘরটি পর্য্যন্ত যেখানে আমার উপর "দৃষ্টি" পড়েছিল, কিন্তু কোথাও একটা ইন্দুর পর্য্যন্ত দেখতে পেলে না।

বিজন হতাশভাবে ব'সে পড়ল। হঠাৎ বললে, এবার আমি একা যাব।

—একা! রক্ষা কর! খুব তো দেখা হ'ল এখনও সখ মেটেনি?

সে মাথা নেড়ে বললে, না দু'জনের সামনে হয়তো 'সে' দেখা দেবে না। একা গেলে হয়তো দেখা পেতে পারি।

—দেখা! তুমি কি পাগল হয়েছ?

আমরা তাকে নিরস্ত করবার জন্যে বহু চেষ্টা করলাম, কিন্তু সে কিছুতেই শুনলো না। অবশেষে স্থির হ'ল টর্চ্চ আর একটা লাঠি নিয়ে সে যাবে আর মাঝে মাঝে শিষ দিয়ে দিয়ে আমরা তার সাড়া নোব।

* * *

আমরা সেই ঘাসের উপর ব'সে ব'সে তার পায়ের শব্দ শুনতে লাগলাম। শুনতে পেলাম সে উপরের হলঘরের সামনে পায়চারী করছে। এইবার বোধহয় সিঁড়ির উপর বসল। পায়ের শব্দ নেই।

একটু পরে সে একটা শিষ দিলে। আমরা সাড়া দিলাম

খানিক পরে আর একটা শিষ। আবার কিছুক্ষণ পরে আর একটাও। এমনি ক'রে বিশ মিনিট চলে গেল। বিশেষ কিছুই ঘটলো না। আমরা ক্রমশঃ উত্যক্ত হ'য়ে উঠলাম। মিছিমিছি ব'সে থাকা। তার চেয়ে বরং বিজনকে ডেকে বাড়ী ফেরা যাক্।

এমন সময়

কি যেন আমাদের উপর দিয়ে চলে গেল!

শব্দ নয়. চারিদিক নিস্তব্ধ। বাতাসও নয়, গাছের পাতা পর্য্যন্ত নড়ছিল না। কিছু দেখাও যাচ্ছিল না। অথচ মনে হ'ল কি যেন একটা মাথার উপর দিয়ে চ'লে গেল,—স্পষ্ট মনে হ'ল।

আর এক সেকেণ্ড পরেই

একটা শীর্ণ, চাপা চাৎকার—আঃ-আঃ-আঃ।

বিজনের কণ্ঠস্বর! এমন ধ্বনি জীবনে আর কখনও শুনিনি।

অকস্মাৎ পিঠে ছোরার আঘাত পড়লে মানুষ যেমন ক'রে চাৎকার ক'রে ওঠে তেমনি ধারা। এমন করুণ এমন মর্ম্মান্তিক চীৎকার জীবনে আর কোনোদিন শুনিনি! এখনও মনে করলে শরীর শিউরে ওঠে।

আমরা লাফিয়ে উঠলাম। জানালার ভিতর দিয়ে ছুটে চল্লাম। ঠিক সেই সময় একখানা মেঘ চাঁদকে ঢেকে দিলে! ঘরের ভিতরে আমরা অথই অন্ধকারের মধ্যে ডুবে গেলাম। ইতিপূর্ব্বে যে সব ছোটখাট জিনিসের উপর দিয়ে অবলীলাক্রমে

লাফিয়ে লাফিয়ে গিয়েছি। অন্ধকারে সেই গুলোকেই পর্ব্বত-প্রমাণ বোধ হইতে লাগল।

অথচ সময় নেই। উপরে তখন দুপ্ দাপ্ শব্দ হচ্ছে। কে যেন ভারী ভারী জিনিস ছুড়ে ছুড়ে ফেলছে। যেন বহুলোক একসঙ্গে ধ্বস্তাধ্বস্তি করছে।

টর্চ্চ! টর্চ্চ!

কোথায় টর্চ্চ? সে তো বিজন নিয়ে গেছে।

দেশলাই? মোমবাতি?

সব বাগানের মধ্যে পড়ে আছে। তাড়াতাড়িতে সেগুলো ফেলে রেখেই ছুটে এসেছি। অথচ সেগুলো আনতেই হ'বে। নইলে উপরে ওঠা অসম্ভব।

আঃ—আঃ আঃ!

আবার সেই শব্দ!

ছুটে গিয়ে বাগান থেকে দেশলাই আর মোমবাতি নিয়ে ফিরে এলাম। নিস্তব্ধ ঘর! আলো জ্বেলে সিঁড়ির দিকে যেতেই দেখি সিঁড়ির শেষ ধাপে বিজন টলতে টলতে নামছে। তার জামা কাপড় চূণবালি এবং ময়লার দাগে মলিন। আমরা জড়িয়ে ধরতেই সে অসহায়ভাবে আমাদের গায়ে ঢ'লে পড়ল।

তাকে বাইরে নিয়ে এলাম! অনেকক্ষণ পরে সুস্থ হয়ে সে যা বললে তা মোটামুটি এইরকম:

প্রথম আমি যখন উপরে গেলাম তখন ঠিক কোনখানটায় দাঁড়ানো যায় ঠিক করতে পারছিলাম না। অবশেষে সিঁড়ির নীচের ধাপে বসাই স্থির করলাম। কারণ এখান থেকে সব

সিঁড়ির শেষ ধাপে বিজন টলতে টলতে নামছে

ঘরগুলিই, বিশেষ দরদালানের ওদিকের সেই অন্ধকার ঘরটি, দেখা যায়। কিন্তু আধ ঘণ্টা বসে থেকে অবশেষে বিরক্ত হ'য়ে উঠলাম। হতাশ হ'য়ে উঠতে যাচ্ছি, এমন সময় মনে হ'ল দরদালানের ওদিকের সেই ঘরটি থেকে কালো মতন কি যেন একটা ছুটে বেরিয়ে এল। তার মুখ দেখা যাচ্ছিল না, শুধু একটা অন্ধকার মূর্ত্তি।

চক্ষের পলকে সে আমাকে একটা ধাক্কায় চীৎ করে ফেলে দিলে। তারপর কি যে ঘটলো তা শুধু আবছা মনে পড়ে। ধাক্কা যেই দিক, সে যে মানুষ নয় তাতে আর ভুল নেই। যে ঘর থেকে সে বার হ'ল সে ঘরে একটু আগেও কেউ ছিল না। অত জোরে সে এল তবু কোনো শব্দ হ'ল না। তার সঙ্গে প্রাণপণে লড়াই করতে করতে আমি অজ্ঞান অবস্থাতেই সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছিলাম। ভগবান জানেন, কি করে নেমে আসছিলাম। গায়ের উপর দিয়ে সাপ বেড়িয়ে বেড়ালে সমস্ত শরীর যেমন ভয় এবং ঘৃণায় রি রি করতে থাকে তেমনি করছিল।

বিজন ক্লান্তভাবে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললে।

কিন্তু সব চেয়ে আশ্চর্য্য এই যে, এর পরে আমরা এবং আমাদের আরও অনেক বন্ধু বহু রাত্রে, এমন কি অমাবস্যার রাত্রেও ওই আশ্চর্য্য বাড়ীতে গেছি। কিন্তু আর কোনো দিন এমন ঘটনা ঘটেনি।

একে তোমরা কি বলবে?